প্রভাতকুমারের
ছোটগল্প

প্রভাতকুমারের ছোটগল্প

ড. শিবেশ চট্টোপাধ্যায়
ও
ড. চিত্তরঞ্জন লাহা
সম্পাদিত

: পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৷ ৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮

প্রকাশক :

কশো মিত্র

সাহিত্য প্রকাশ

৬০ জেমস লঙ সরণি

কলকাতা : ৩৪

মুদ্রাকর :

রেখা দে

শ্রীহরি প্রিন্টার্স

১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলকাতা : ৪

: সূচীপত্র :

ভূমিকা এক

দেবী ১

কাশীবাসিনী ১৩

প্রণয়-পরিণাম ৩২

অযোধ্যার উপহার ৪৪

আধুনিক সন্ন্যাসী ৫২

বিবাহের বিজ্ঞাপন ৫৮

স্বর্ণ-সিংহ ৬৭

ফুলের মূল্য ৭৯

রসময়ীর রসিকতা ৯৬

মাতৃহীন ১১৫

ভূমিকা

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [১৮৭৩-১৯৩২] একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করলেও ছোটগল্পেই প্রভাতকুমারের প্রতিভার সার্থক বিকাশ ও প্রকাশ। ছোটগল্পকার হিসেবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। সমসাময়িককালে জনপ্রিয়তায় তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করেছিলেন। অবশ্য শুধু জনপ্রিয় বললে তাঁর প্রতিভাকে খাটো করে দেখা হয়, তিনি শক্তিমান লেখক। গল্পের আঙ্গিকের দিক থেকে এবং নির্ভার ও নিটোল গল্প রচয়িতা হিসেবে আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রভাতকুমার যখন ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রভাতকুমার নিজে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রানুরাগী হলেও তাঁর গল্পে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ নেই। শিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক, আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ এবং উৎসাহ পাথেয় করেই প্রভাতকুমার বাংলা গদ্য রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জহুরী চিনতে ভুল হয়নি। পদ্য নয় গদ্যই যে প্রভাতকুমারের সঠিক পথ পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছিল। প্রভাতকুমারের প্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই আবিষ্কার করেছিলেন। ফলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথও প্রভাতকুমারের ছোটগল্পের গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর গল্পের উচ্চ প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোটগল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন ……।' প্রভাতকুমারের গল্পের প্রধান গুণই প্রবহমানতা। তাছাড়া আছে কৌতুকাশ্রিত প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধরস।

বিশ্বখ্যাত মোপাসাঁর সঙ্গে প্রভাতকুমারের তুলনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই তুলনা নিতান্তই বহিরঙ্গমূলক। মোপাসাঁ ছিলেন দুঃখবাদী, কিন্তু প্রভাতকুমার আনন্দবাদী। জীবনে দুঃখ, বেদনা, লোভ, বঞ্চনার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি যে অনবহিত ছিলেন তা নয় বরং অত্যন্ত সচেতনই ছিলেন। কিন্তু এক উদার আনন্দময় দৃষ্টির অধিকারী প্রভাতকুমার এই সব কিছু থেকেই আনন্দের অমৃত ভাণ্ডার আবিষ্কার

করেছিলেন। এই কারণেই সাধারণভাবে প্রভাতকুমার কৌতুক রসস্রষ্টা বা হাসির গল্পের লেখক রূপেই পরিচিত। প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষার আধারে রচিত আদ্যন্ত কৌতূহল সৃষ্টিকারী কাহিনীগুলি অনাবিল কৌতুক রসে স্নাত হয়ে পাঠকের হৃদয়ে একটা আশ্চর্য ভালোলাগার আমেজ সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে প্রণয় পরিণাম, বিবাহের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর গল্পের ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি এবং অসঙ্গতিকে অসামান্য কৌতুকরসরূপ দান করেছেন লেখক। কয়েকটি গল্পে অসঙ্গতির মূল বিন্দুকে অনুসরণ করলে সমসাময়িক সমাজের অবক্ষয় এবং বিপর্যয়ের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হতে পারত। কিন্তু প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই গল্পগুলি নির্দোষ হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পেরেছে। তাছাড়া প্রভাতকুমার ছিলেন রক্ষণশীল। এই কারণে সমাজ প্রচলিত কোনো সংস্কারের বিরোধিতার চেষ্টা তিনি করেননি। নতুন কোন জীবনসত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পও তাঁর ছিল না। জীবনের ভারবোধকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তিনি নিজ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন প্রধানত মানবজীবনের সেই আপাতলঘু মুহূর্তগুলির দিকে, যা সহৃদয়তার স্পর্শে অসামান্য হয়ে উঠেছে।

প্রভাতকুমারের হাস্যকৌতুক সর্বত্র সুরুচি এবং শিল্পগুণসম্মত। ভাঁড়ামি জাতীয় ইতরতা, হাসির নামে তাঁর কাছে কখনও প্রশ্রয় পায়নি। তাঁর গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত বিচিত্র ঘটনাসংস্থান ও পরিবেশ রচনার অসামান্য নৈপুণ্যে। কৌতুকরস সেখানে অনায়াস এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এই প্রসঙ্গে বর্তমান সংকলনে সন্নিবিষ্ট প্রণয় পরিণাম, বিবাহের বিজ্ঞাপন, রসময়ীর রসিকতা ইত্যাদি গল্পগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই গল্পগুলির কোনো চরিত্রই কিন্তু অস্বাভাবিক বা হাস্যকর নয়। কিন্তু পরিবেশ রচনার গুণে গল্পগুলি অনাবিল হাস্যরসের উচ্ছ্বাস ঘটিয়েছে। ইংরেজিতে যাকে হিউমার বলে প্রভাতকুমারের হাস্যরস ঠিক তাই। প্রভাতকুমার মানুষের ভুল ভ্রান্তি এবং অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য নিয়ে গল্প লিখেছেন। মানুষের দোষত্রুটি এবং ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে কখনও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেননি প্রভাতকুমার, বরং মানুষের সমস্ত অন্যায় এবং অবৈধ আচরণকেও তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রভাতকুমারের হাসির পশ্চাতে অশ্রুর অনতিলক্ষ্য প্রবাহ। শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্টের এই বৈশিষ্ট্য প্রভাতকুমারে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান।

বর্তমান সংকলনে গৃহীত 'প্রণয় পরিণাম' গল্পটি নির্মল শুভ্র হাস্যরসের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গল্পে অকাল পরিপক্ক কিশোর মাণিকলালের প্রেমকে কেন্দ্র করে

হালকা হাসির সৃষ্টি করেছেন লেখক। মানিক চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের অনেক উপন্যাস পড়ে ফেলেছে। উপন্যাসের রীতিতেই বাল্য সঙ্গিনীর প্রতি প্রেম নিবেদন করেছে এবং প্রণয়কে পরিণয়ে পরিণত করবার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু প্রেম স্থায়ী হতে পারেনি ডাক্তার পিতার প্রবল চপেটাঘাতে। গল্পের শেষে লেখক বলেছেন—'উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খ ইল যে তাহার পরদিন অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে সপ্তাহ খানেক স্কুলে গেল না।' প্রণয় রোগের অনেক প্রকার চিকিৎসার কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু একটিমাত্র চপেটাঘাত এবং কয়েকটি মাত্র লুচির সাহায্যেও যে এ রোগ সুচিকিৎস্য—প্রভাতকুমার ছাড়া আর কেউ সে কথা বলেন নি। বলা বাহুল্য এ চিকিৎসা হাকিমী বা কবিরাজী নয়, নিছকই টোটকা। প্রসন্ন পরিহাসের ছাঁদনাতলাতেই এই কিশোর প্রণয়ের শেষ দৃশ্য অভিনীত হয়েছে এবং সেখানে গল্পের নায়ক ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে প্রণয় প্রসঙ্গ বেমালুম বিস্মৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে, প্রভাতকুমারের মতে বাল্যপ্রণয়ের পরিণামে উপাদেয় আহারের আয়োজন এবং সেই আহারে রুচিও আছে।

'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটি কিন্তু হাসির গল্প হয়েও হাল্কা গল্প নয়। দজ্জাল রসময়ীর জীবনের পরিণতিতে এক সুগভীর বেদনা বর্তমান।—সে জীবিত থাকতে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে দেয়নি। কিন্তু মারা যাওয়ার পরও অভিনব উপায়ে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে বাধা দিতে থাকে। প্রেতলোক থেকে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে নিরস্ত করবার জন্য ভয় দেখিয়ে রসময়ীর নিজের হাতের লেখা চিঠি আসতে থাকে একের পর এক। ফলে গল্পটিতে এক অতি প্রাকৃত পরিবেশের এবং পাঠকহৃদয়ে এক প্রবল উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। গল্পের সমাপ্তিতে অবশ্য সব রহস্য ফাঁস হয়ে যায় এবং সমস্ত উৎকণ্ঠারও পরিসমাপ্তি হয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে দজ্জাল রসময়ী পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করে তাদের হৃদয়ে এক করুণ বিষাদ সঞ্চারিত করে দেয়। গল্পটি হাসির গল্প হয়েও জীবনবোধের গভীরতার স্পর্শে এক অসামান্য রূপ লাভ করেছে। 'রসময়ীর রসিকতা'র অন্তরালে নারীমনের সাধ ও স্বপ্নের করুণ ব্যঞ্জনা।

হাসির গল্প রচনাতেই প্রভাতকুমারের প্রসিদ্ধি হলেও তিনি এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন সেগুলি করুণ রসের গল্প এবং সেগুলিতে গভীর জীবনবোধের অবিনশ্বর স্বাক্ষর। 'দেবী', 'কাশীবাসিনী', 'ফুলের মূল্য' ঠিক এই ধরণের গল্প। হাস্যরসে

যাঁর অবিসংবাদিত অধিকার করুণ রস সৃষ্টিতেও তাঁর সাফল্য অসামান্ত। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'সব্যসাচী' বিশেষণটি এদিক দিয়েও আশ্চর্য সার্থক।

'দেবী' গল্পটির প্লট অবশ্য প্রভাতকুমারের নিজস্ব নয়—পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তবে রচনা প্রভাতকুমারের নিজস্ব। এই গল্পে জীবনের এক কঠোর রূপকে দেখিয়েছেন লেখক। গল্পের পরিণামে মানবজীবনের বিনষ্টিতে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। দেবীতে হাস্তকৌতুকে প্রসন্ন দৃষ্টি প্রভাতকুমার যেন ভূমিকা বদল করে বিচারক এবং সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অন্ধবিশ্বাসের ট্র্যাজিক পরিণতিই গল্পটির বিষয়।—'দেবী' নামকরণটিও অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী। আত্মহত্যার মধ্যে দিয়েই নকল দেবীর বিসর্জন এবং আসল দেবীর বোধন। তবে সেই বোধন বুককাটা আর্তনাদের বেদনাময় পরিবেশে।

গল্পটির শুরু নবপরিণীতা স্বামি-স্ত্রীর প্রণয়ালাপের মধ্য দিয়ে। প্রভাতসূর্য আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করতে আরম্ভ করেছে—উমাপ্রসাদ এবং দয়াময়ী তাদের ভবিষ্যতের সুখী দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার মধ্যেই যেন ট্র্যাজিডির ছায়াপাত ঘটে গেছে—নিবিড় মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের গাঢ় অন্ধকার যেন দেখতে পায় দয়াময়ী। দয়াময়ীর হৃদয় যখন অকারণ অমঙ্গলের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত তখন দয়াময়ীর পরম কালীভক্ত শ্বশুর—স্বপ্নাদেশ পেয়ে দয়াকে দেবীত্বে অভিষিক্ত করেছেন।—মানবী থেকে দেবীতে উন্নীতা বালিকার মধ্যে ধীরে ধীরে এসেছে পরিবর্তন। অলৌকিকতার ছোঁয়া যেন অদৃষ্টের মতোই কাজ করে গেছে—দেবীর চরণামৃত পানে সন্তানহীনার নির্বিঘ্ন সন্তানলাভ, শিশুর রোগমুক্তি ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনা দয়াকেও নিজের দৈবসত্তা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। দেবী তখন স্বামীকেও পরিত্যাগ করেছে—স্ত্রীভাবে তাকে স্পর্শ না করতে অনুরোধ জানিয়েছে, ফলে ক্ষোভে দুঃখে স্বামী উমাপ্রসাদ চিরকালের জন্ত গৃহত্যাগ করেছে। মধুর দাম্পত্যের এই বিষাদময় পরিণতিতেই গল্পটির সমাপ্তি ঘটেনি। গল্পের সমাপ্তিতে দয়ার অতি আদরের ভাস্থর পুত্রকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে দেবীর অন্ধ বিশ্বাস ভেঙে খান্ খান্ হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে সে সর্বশক্তিমানা দেবী নয়—অসহায়া মানবী মাত্র। কিন্তু আজ আর ফেরার কোনো উপায় নেই। অতি প্রত্যূষে কালীকিঙ্কর মন্দিরে এসে দেখেন শাড়ীকে রজ্জুর মত পাকিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে দেবী আত্মহত্যা করেছেন। দেবীর আত্মহত্যা অন্ধ বিশ্বাসের অপমৃত্যু শুধু নয়, একটি মানবীরও অকাল মৃত্যু এবং সেই কারণেই অত্যন্ত বেদনাময়।

'কাশীবাসিনী'ও গভীর জীবনবোধেরই গল্প, তবে একটু অন্তরকম। সমাজচ্যুতা

রমণীর হৃদয়েও যে সন্তান-বাৎসল্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকানো থাকতে পারে অপূর্ব সহৃদয়তার সঙ্গে প্রভাতকুমার পাঠককে সে বিষয়ে সচেতন করেছেন। পদস্খলিতা কাশীবাসিনী শৈশবে পরিত্যক্তা তাঁর একমাত্র সন্তান মালতীর কাছে এসেছেন—কিন্তু লজ্জায় নিজের পরিচয় দিতে পারেন নি। কাহিনীর শেষাংশে মাতার অনুশোচনা, কন্যার দ্বিধা এবং প্রবল আবেগ ফুটে উঠেছে অতি অল্প আয়োজনে—লেখককে মোটেই বাগাড়ম্বর করতে হয়নি।

'মালতীর একবার একটু একটু কান্না পাইতে লাগিল। আপনার মা না জানিয়াও ইঁহার প্রতি যে মাতৃবৎ আকর্ষণ হইয়াছিল, তাই মনে পড়িল। কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, কেন তুমি জানালে তুমি কে?'

'কি জানি। থাকতে পারলাম না।' মালতী আবেগভরে একবার বলিতে যাইতেছিল জানিয়েছ ভালই করেছ। নইলে মা ত কখনো চক্ষে দেখতে পেতাম না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল এ মা! নাই দেখতাম।' উদ্ধৃত অংশে ভাবাবেগ প্রকাশে সংযত এবং সুসংহত ভাষার এমন প্রয়োগ দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল।

'ফুলের মূল্য' বা 'মাতৃহীন' উভয় গল্পেই লেখকের কৌতুক প্রবৃত্তির পরিবর্তে হৃদয়-বৃত্তির অনুপম প্রকাশ। উভয় গল্পেরই পটভূমিকা বিলাত। 'ফুলের মূল্য' কাহিনীর সূত্রপাত লণ্ডনের এক নিরামিষ ভোজনশালায়। ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ বসন্তের এক ইংরেজ বালিকা গল্পটির নায়িকা। অশ্রুসজল এই অপরূপ ভালোবাসার সাম্রাজ্যে প্রভাতকুমার যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁর নিজস্ব স্বভাবধর্ম বিস্মৃত হয়েছেন। হাসির দমকা বাতাস এই দুটি গল্পের শান্ত করুণ পরিবেশকে মুহূর্তের জন্যও উচ্চকিত করেনি। দুটি গল্পের গায়েই মমতার আশ্চর্য প্রলেপ, মাধুর্যের অপরূপ আস্বাদ। মানবের [এ ক্ষেত্রে মানবীর] হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ যে দেশকালনিরপেক্ষ গল্প দুটিতে সেই সত্যই সোচ্চার।

'ফুলের মূল্য' গল্পের ম্যাগি এক বুক-চাপা বেদনার নীরব প্রতিমা। স্নেহে সজল, কর্তব্যে অবিচল এই বালিকাটি শুধু করুণার পাত্রী নয়, শ্রদ্ধারও পাত্রী। নিদারুণ দুঃখের হাত থেকে বৃদ্ধা মাতাকে বাঁচাতে তার প্রয়াস ও পরিকল্পনার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ছলনা যে কখনো কখনো সততাকে লজ্জা দিতে পারে গল্পটিতে তারই পরিচয় পাই। 'ফুলের মূল্যে'র আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির কথা মনে পড়তে পারে। অবশ্য গল্প দুটিতে খুব একটা সাদৃশ্য নেই। তবে লেখকদ্বয়ের সহানুভূতি ও সমবেদনার স্পর্শে দুটি গল্পই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'কাবুলি-ওয়ালা'র বিষয় পিতৃস্নেহ, 'ফুলের মূল্যে'র ভ্রাতৃপ্রীতি। মিনির পিতা কাবুলিওয়ালাকে

টাকা দিয়ে দেশে ফিরে কন্যার সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই টাকা দান করায় তাঁর নিজের মেয়ের বিয়ের উৎসবের দু-একটি অঙ্গ বাদ দিতে হয়েছে। কিন্তু এই ত্যাগ শুধু নিজের পিতৃগৃহ নয় সমগ্র বঙ্গসাহিত্যকে পিতৃস্নেহের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। 'ফুলের মূল্য'ও হৃদয় ধর্মের অনুরূপ আলেখ্য। বিদেশে মৃত ভ্রাতার কবরে ফুল দেবার জন্য ম্যাগি তার কষ্টার্জিত একটি শিলিং গল্পবক্তার হাতে তুলে দিয়েছে। বক্তা অনায়াসে এই শিলিংটি ফেরৎ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন :

'এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে শ্রমলব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য, সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া লাভ কি?'

'মাতৃহীন' গল্পটি 'প্রণয় পরিণাম' গল্পের উল্টো পিঠ। দ্বিতীয়টিতে প্রণয় উপহসিত প্রথমটিতে অভিনন্দিত। 'প্রণয় পরিণাম' প্রেমের লঘু কথা, 'মাতৃহীন' প্রেমের গুরু কথা। এক আশ্চর্য মহিমময় প্রেমের অধিকারিণী এই গল্পের বিদেশিনী নায়িকা। প্রেমের পাত্রকে তিনি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু প্রেমের অঙ্গীকার তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। বধূরূপে স্বামীর সংসারে প্রবেশের সৌভাগ্য তিনি পাননি, কিন্তু স্ত্রীর কর্তব্য পালনে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরাগের দুর্গে কোনোদিন ফাটল ধরেনি। গল্পটির প্রারম্ভে প্রণয় রস, পরিণামে বাৎসল্য রস। দুটি পৃথক রসের অসামান্য সমাবেশ ও সামঞ্জস্যে 'মাতৃহীন' প্রভাত-কুমারের এক অপরূপ শিল্পসৃষ্টি।

'অযোধ্যার উপহার' গল্পটিও রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয় গল্পেরই বিষয় প্রভুভক্তি। ভৃত্য অযোধ্যা-বিহারের মানুষ। প্রভাতকুমারের বহু গল্পে বিহারের মাটি ও মানুষের উল্লেখ আছে এবং তার কারণও আছে। গল্পের পটভূমিকা সৃষ্টিতে প্রভাতকুমার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার চৌহদ্দি অতিক্রম করেননি। বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 'অযোধ্যার উপহার' গল্পের আসল ঘটনাস্থল কলকাতা হলেও গল্পের নায়ক অযোধ্যার বাড়ি বিহারের একটি অখ্যাত গ্রামে। মুঙ্গের ষ্টেশন থেকে দশ ক্রোশ দূরে গ্রামটির ঠিকানা। অখিলবাবু যখন আইন পাশ করে মুঙ্গেরে ওকালতি শুরু করেন তখন থেকেই সে তাঁর বাড়িতে কর্মরত। অখিলবাবু যখন মুঙ্গের কোর্ট

ছেড়ে হাইকোর্টে যান তখন অযোধ্যাও তাঁর সঙ্গে যায় এবং প্রায় আঠারো বছর ধরে সেখানেই থাকে। দীর্ঘদিন বাঙ্গালী বাড়িতে থাকার ফলে বাংলাটা সে ভালোই জানে। লেখকের ভাষায় 'প্রায় বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গালা কহিতে পারে।' অবশ্য রেগে গেলে সে বাংলা না বলে হিন্দীই বলে। তবে এ বাবদে লেখকের কথা এই যে: অযোধ্যা কেন—অনেক বাঙ্গালীও প্রবল ক্রোধের সময় বাঙ্গালা কহিতে পারেন না—হিন্দী বা ইংরাজী কহিয়া থাকেন।' অযোধ্যার নির্লোভ চরিত্র ও নিরুপম প্রভুভক্তি গল্পটির অন্যতম সম্পদ এবং অবশ্যই প্রধান আকর্ষণ।

পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ মানুষের সাহস, শক্তি, সততা এবং সেবাপরায়ণতার প্রশংসায় বাংলা সাহিত্য সর্বদাই সরব ও সোচ্চার। প্রভাতকুমারের গল্পেও তাদের মহিমময় মুখশ্রী বারংবার উদ্ভাসিত। তন্মধ্যে অযোধ্যারাম মাহাতোর মুখটি সর্বাধিক উজ্জ্বল।

গল্পটিতে বিহারের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ও রীতিনীতির যে চিত্র পাই তা সংক্ষিপ্ত হলেও বিশ্বস্ত। এখানের লোকায়ত মানুষ বর পণ পায় না, কন্যা পণ দেয়। বিয়ে করলে কত টাকা পাবে খুকীর এই প্রশ্নের উত্তরে "অযোধ্যা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'টাকা মিলবে কি আউর দেনে পড়ি রাকুসি। 'একি বাঙ্গালীর সাদি'?" এরা লেখাপড়া জানে না, কাজেই চিঠিপত্র লেখাতে হলে শিক্ষিত মানুষের সাহায্য নেয়। তবে সে কাজ যে অনায়াসে সম্পন্ন হয় সে কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। অযোধ্যা মনিবের কাছে ইংরেজিতে চিঠি লেখার জন্য খড়কপুরের পোষ্টমাস্টারের সাহায্য নিয়েছিল, বিনিময়ে 'কিঞ্চিৎ উত্তম গব্যঘৃত' উপঢৌকন দিয়েছিল। গ্রাম্য মানুষগুলির সরলতার এবং সহৃদয়তার বেশ কিছু পরিচয় ছড়িয়ে আছে গল্পটির বুকে। অযোধ্যার বাড়ীর মৃত্যু সংবাদ জানাতে গ্রামের লোকেরা তাকে যে বেয়ারিং চিঠি পাঠিয়েছিল তাতে ঠিকানা ছিল 'অযোধ্যা মাহাতো, মোকাম কোলকাত্তা।' স্বাভাবিক কারণেই ডাক বিভাগ চিঠিটি মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি, তবে প্রেরকের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছিল। সেদিনের ডাক বিভাগের কাজকর্মের প্রশংসা করতেই হয়। অযোধ্যা মনিবের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে ডাক পিয়নকে মাচা থেকে পেড়ে একটা বিলাতী কুমড়া বখশিস দিয়েছিল।

'কাশীবাসিনী' গল্পের পটভূমিকাও বিহারে—'দানাপুর স্টেশন হইতে দানাপুর সহর পাঁচ মাইল দূরে, স্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার নাম খগোল।' শেষাংশে গল্পের পটভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে 'তাড়িঘাটে' দাঁড়িয়েছে কিন্তু বিহারের সীমা অতিক্রম

করেনি। এই গল্পের বুড়ি দাই ভজুয়ার মা বিহারের মানুষ। চরিত্রটি নির্লোভ ও বিশ্বাসী। বাঙালীর বাড়িতে দীর্ঘদিন কাজ করেও বাংলাটা আয়ত্ত করতে পারেনি। তার সঙ্গে মালতীকে হিন্দীতেই কথাবার্তা বলতে হয়।

'আধুনিক সন্ন্যাসী' গল্পের পটভূমিকা বিহারের বাঁকীপুর। গল্পটিতে বাঁকীপুরের 'মহাদেবস্থান' এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে।

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পের নায়কের ঠিকানা—'সহর গাজীপুর, মহল্লা গোরা বাজার।' তবে গল্পের আসল ঘটনাস্থল 'কেদারঘাট, বেনারস সিটি'। এই গল্পের সব পাত্রপাত্রীই পশ্চিমের মানুষ। অবশ্য পাত্রপাত্রী না বলে শুধু পাত্র বলাই উচিত ছিল। কারণ এই গল্পে কোনো নারী চরিত্র নেই। বিজ্ঞাপিত পাত্রী যে সাতপাকে বাঁধা পড়েছে সে সংবাদ আমাদের জানিয়ে দেওয়া হলেও রামঅওতার বা পাঠকের সতৃষ্ণ নয়নের সম্মুখে সে আদৌ আবির্ভূত হয়নি। কাশীর কান্হাইয়ালাল 'ফোটু গিরাপ' [ফটোগ্রাফ] কাকে বলে জানে না। মিশ্রজী তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, 'ঐ যে তসবীর হয়; 'একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে; মানুষকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তসবীর উঠে; তাহাকেই ফোটু গিরাপ বলে।'

'স্বর্ণসিংহ' গল্পের ঘটনাস্থল বিহারের সাসেরাম। তখনকার দিনে সাসেরামে যেতে হলে আরা স্টেশনে নেমে এক্কা গাড়ি করে তিন-চার দিনের পথ অতিক্রম করতে হত। সেদিন পশ্চিমাঞ্চলে বাঙালীর খ্যাতি ও খাতির দুই-ই ছিল। তবে মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের মতো স্বার্থান্বেষী কুটিল চরিত্রের মানুষ সেদিনও ছিল। বিহারের মাটি ও মানুষের কয়েকটি সজীব চিত্র ও চরিত্র এই গল্পের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। গ্রীষ্মকালে পাসীরা তাড়ির জন্য তাল গাছে 'লাবনি' বাঁধতে উঠত। প্রত্যহ প্রভাতে পাসীদের চীৎকার শোনা যেত—'তার চিঢ়ো'—'অর্থাৎ আমি তাল গাছে চড়ছি'। এই চীৎকারের উদ্দেশ্য কুলবধূদের সতর্ক করে দেওয়া—তারা যেন উঠোন ছেড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। পুরুষদের দৃষ্টিপথ থেকে মেয়েদের সরিয়ে রাখাই এর উদ্দেশ্য। তবে আধুনিক কাল সেখানেও প্রবেশ করেছে। মুন্সী জোয়ালা-প্রসাদের শিক্ষিত পুত্র সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃ নির্বাচিত কন্যার পরিবর্তে স্বনির্বাচিত কন্যাকেই বধূরূপে গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প। গল্পের তাবৎ সমস্যা তার এই সংকল্পকে কেন্দ্র করেই। সুখের কথা এই যে, প্রভাতকুমারের গল্পে সব সমস্যারই সমাধান আছে, আছে সব সঙ্কটের মুক্তি ও সব দুঃখের সান্ত্বনা।

'স্বর্ণসিংহ' গল্পের সমস্যাটি সার্বজনীন—পাত্র পক্ষের অদম্য ধনলোভ এবং কন্যার

বিবাহ সমস্যা। বলা বাহুল্য এই বহু পরিচিত সমস্যাটি নিয়ে প্রভাতকুমার কোনো মানসিক ব্যায়াম করেননি ; মধুরেণ সমাপয়েৎ নীতি অনুসারেই গল্পটি শেষ করেছেন। আনন্দ বা বিষাদ যাই হোক না কেন একটা আশ্চর্য পরিতৃপ্তির অনুভূতি প্রভাতকুমারের গল্পের শেষে সহৃদয় পাঠকের জন্ত অপেক্ষা করে থাকে।

'দেবী' গল্পে অলৌকিক অন্ধবিশ্বাসের আত্যন্তিকতা নিদারুণ পরিণামের জন্ত অনেকাংশেই দায়ী। অন্তথা প্রভাতকুমার অত্যন্ত সহৃদয় গল্প লেখক। লোভী বা দুষ্ট মানুষের জন্ত তিনি যে শাস্তি বিধান করেন তাতে একটুখানি আঘাতের সঙ্গে, অনেকখানি ক্ষমার বিধান থাকে।

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। মহাদেও রামঅওতারের সবকিছু কেড়ে নিলেও যাতে সে অন্নাভাবে মারা না যায় তজ্জন্ত তাকে সন্ন্যাসী বেশে সাজিয়ে দিয়েছে এবং কয়েকটি পয়সাও তার ঝুলিতে ফেলে দিয়েছে। গল্পটির শেষাংশে ধার্মিক ব্যক্তি রূপে রামঅওতারের যে খ্যাতিলাভ সেটুকু নিঃসন্দেহে সহৃদয় লেখক প্রদত্ত সান্ত্বনা পুরস্কার ছাড়া অন্ত কিছু নয়।

'স্বর্ণসিংহ' গল্পের লোভী জোয়ালাপ্রসাদ স্বর্ণসিংহটি গলিয়ে এক কানাকড়িও না পেলে পাঠক পরিতৃপ্ত হতেন, কিন্ত লেখক তাকেও সম্পূর্ণ নিরাশ করেননি, 'দুই শত টাকার আন্দাজ সোনা' তার হাতেও তুলে দিয়েছেন।

জনৈক রসিক সমালোচক প্রভাতকুমারের গল্পগুলিকে 'বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য' বলে অভিহিত করেছেন। মন্তব্যটি অত্যন্ত সমীচীন। শুধু সংযোজন এই যে, প্রভাতকুমারের প্রতিভার কল্যাণে জীবনের অপরূপ কথাই রূপকথার ন্যায় স্বাদু ও সুখ পাঠ্য হয়েছে। রুগ্ন মনোবৃত্তি এবং অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গিকেই যাঁরা গভীর জীবনবোধের একমাত্র লক্ষণ বলে মনে করেন এবং সেই কারণে প্রভাতকুমারের গল্পে গভীর জীবন-বোধের অভাব বলে আক্ষেপ করেন তাঁরা দেবী, ফুলের মূল্য বা মাতৃহীন ইত্যাদি গল্প-গুলিকে আর একবার পাঠ করলে নিজেদের মন্তব্য পরিহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রভাতকুমার জীবনের গভীরতায় অনায়াস অবগাহন করেছেন, তবে সেখানে পঙ্কের ক্লেদাক্ত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হননি, পঙ্কজের শোভা ও সৌন্দর্যকেই পুলকিত বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করেছেন।

আলোচ্য সংকলনে সংকলিত গল্পগুলিতে প্রভাতকুমারের রচনা ক্ষমতার ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টিতে, পটভূমির বিস্তারে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, রচনা কৌশলে, দূরগামী কল্পনা শক্তিতে, জীবনকে প্রত্যক্ষ

করার সহজ সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গিতে, অনাবিল কৌতুক সৃষ্টিতে এবং জীবনবোধের গভীরতায় প্রভাতকুমার যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন আলোচ্য সংকলনে গৃহীত গল্পগুলি তারই পরিচয় বহন করছে।

শিবেশ চট্টোপাধ্যায়
চিত্তরঞ্জন সাহা

প্রভাতকুমারের ছোটগল্প

দেবী

সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা।

পৌষ মাসের দীর্ঘরজনী আর কিছুতেই পোহাইতে চাহে না। উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল, স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল তাহার ষোড়শী পত্নী এক পাশে গুটিসুটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সরিয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার গায়ে লেপখানা চাপাইয়া দিল। পাশে পায়ের দিকে হাত দিয়া দেখিল কোথাও ফাঁক বহিতেছে কি না।

উমাপ্রসাদ বিংশতিবর্ষীয় যুবক। সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা নাই ;—পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই। অনেকের বিশ্বাস উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

উমাপ্রসাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই নূতন। স্ত্রীর নাম দয়াময়ী।

স্ত্রীর গাত্র আবৃত করিয়া উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একখানি হাত রাখিল—দেখিল সে স্থান শীতে শীতল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পত্নীর মুখচুম্বন করিল।

যেরূপ নিয়মিত তালে দয়াময়ীর নিঃশ্বাস বহিতেছিল, সহসা তাহার ব্যতিক্রম হইল। উমা জানিল স্ত্রী জাগিয়াছে। মৃদুস্বরে ডাকিল "দয়া।"

দয়া বলিল—"কি"। "কি"টা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিল।

"তুমি বুঝি জেগে রয়েছ ?"

দয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—"না ঘুমুচ্ছিলাম।"

উমাপ্রসাদ আদর করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল—"ঘুমুচ্ছিলে ত উত্তর দিলে কে ?"

দয়া তখন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইল। বলিল—"আগে ঘুমুচ্ছিলাম, এখন জেগে উঠলাম।"

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কখন ? ঠিক কোন্ সময় ?"—উমা ভারি দুষ্ট।

"কোন সময় আবার ? সেই তখন !"

"কখন ?"

"যাও আমি জানিনে।''—বলিয়া দয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিল।

ঠিক কখন জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতে ছাড়িবে না। কিয়ৎক্ষণ মান অভিমানের পর দয়ার পরাজয় হইল। উত্তর দিল "সেই যখন তুমি''—বলিয়া থামিল।

''আমি কি করলাম ?''

দয়া খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—"সেই যখন তুমি আমার চুমু খেলে,—হল ! মাগো মা ! এত জান !"

তখনও এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে। দুজনে কত কথা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ কথারই না আছে মাথা না আছে মুণ্ড। চার, শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রপিতামহগণের তরুণবয়স্ক পিতামাতাগণ, অসার অপদার্থ আমাদেরই মত 'এমনি চঞ্চল মতি গতি' ছিলেন। অত বড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ সে পর্য্যন্ত একদিনও স্ত্রীর নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকান্যাসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং যমনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।

নানা কথার পর উমাপ্রসাদ বলিল—"দেখ, আমি পশ্চিমে চাকরি করতে বেরুব।''

দয়া বলিল—''তোমার আবার চাকরি করা কেন ? তোমার কিসের দুঃখ ? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে নাকি ?''

''আমার এখানে দুঃখ আছে বইকি।''

''কি ?''

"তুমি যদি আমার দুঃখ বুঝবে তা হলে আর আমার দুঃখ কিসের !''

শুনিয়া দয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, কি দুঃখ ?—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু দুষ্টামি বুদ্ধি আসিল। বলিল "তোমার কি দুঃখ ? আমি বুঝি মনের মত হইনি ?'' দয়া জানিত এ কথা বলিলে উমাপ্রসাদকে আঘাত করা হইবে।

উমাপ্রসাদ প্রিয়ামুখে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করিয়া এই আঘাতের প্রতিশোধ লইল। পরে বলিল—

''আমার দুঃখ তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধু রাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাব, সেখানে তোমায় নিয়ে

যাব, কেমন দুজনে একলা থাকব, সারাদিন সারারাত !"

"চাকরি করবে ত সারাদিন আমাকে নিয়ে থাকবে কেমন করে ? আমাকে ত একলা ফেলে তুমি কাছারি চলে যাবে।"

"কাছারি গিয়ে খুব শিগগির শিগগির ফিরে আসব।"

দয়া ভাবিয়া দেখিল, তা হইতে পারে বটে। কিন্তু বাধা বিপত্তি যে অনেক !

"তুমি ত নিয়ে যাবে, সবাই যেতে দেবে কেন ?"

"এখান থেকে কি নিয়ে যাব ? যখন শুনব তুমি বাপের বাড়ী রয়েছ তখন চুপি চুপি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

শুনিয়া দয়া হাসিল। এও কি সম্ভব নাকি ?

"কতদিন আমরা থাকব সেখানে ?"

"অনেক বচ্ছর থাকব।"

দয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল, সহসা একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। বলিল —"খোকাকে ফেলে কি অনেক বচ্ছর আমি বিদেশে থাকতে পারব ?"

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গালে গাল রাখিয়া কাণের কাছে বলিল—"ততদিন তোমারও একটি খোকা হবে।" কথাটি শুনিয়া দয়ার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

উল্লিখিত খোকাটি উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান। স্বয়ং উমাপ্রসাদ এ বাটীর শেষ খোকা। এই পরিবারে খোকা-রাজার সিংহাসন বহুকাল শূন্য ছিল, তাই খোকার বড় আদর ; খোকা বাড়ীসুদ্ধ সকলের চক্ষে মণি। খোকার মা হরসুন্দরী,—তাঁর ত আর গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

দয়া সহসা বলিল—"আজ এখনো খোকা এল না কেন ?"—ভোর রাত্রে রোজ খোকা কাকীমার কাছে আসে। এটি তার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহকার্য্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষতঃ তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য্য তাহাতে দয়া ছাড়া অপর কাহারও হস্তস্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। সারাদিন এই সমস্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খোকাকে সে একমুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল করিত না। কাকীমা গা মুছাইয়া না দিলে খোকা গা মুছে না, কাকীমা কাজল না পরাইয়া দিলে খোকা কাজল পরে না, কাকীমার কোলে ভিন্ন অন্য কোথাও শুইয়া খোকা দুধ খায় না। খোকার বিছানায় তার কাকীমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে,—ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেই খোকা কাকীমা বলিয়া কান্না জুড়িয়া দেয়। এই প্রগলভতা, এই

অন্যায় আবদারের জন্ত মধ্যে মধ্যে তাহাকে হরসুন্দরীর নিকট হইতে চড়টা চাপড়টা পুরস্কার পাইতে হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য তাহাতে কান্না না থামিয়া আরও দশগুণ বাড়িয়া উঠে। তখন হরসুন্দরী তাহাকে কোলে করিয়া, ক্রোধে ও নিদ্রাঘোরে টলিতে টলিতে দয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া ডাকেন—"ছোট বউ ও ছোট বউ, এই নে তোর খোকাকে।" বলিয়া, দয়ার দুয়ার খুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই, খোকাকে মাটিতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে, না থাকিলেও খোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়, "কে মেরেছে, কে মেরেছে" বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথার শিয়রে পাণের ডিবায় কোনও দিন কদমা, কোন দিন বাতাসা, কোনও দিন নারিকেল নাড়ু সঞ্চিত থাকে, তাই খোকা ভক্ষণ করে, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কাকীমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়। আজ এখনও খোকা আসিল না বলিয়া দয়া কিছু উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল—"বাছার অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বোধ হয় এখনও রাত্রি আছে। দেখি দাঁড়াও।"

উমাপ্রসাদ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালা খুলিল। বাহিরে আম ও নারিকেল বৃক্ষবহুল বাগান। তখনও চন্দ্রাস্ত হয় নাই,—কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। দয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। বলিল—"রাত আর বেশী কই?"

শীতের হিমবায়ু হু হু করিয়া জানালা-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। তবু দুজনে সেই অল্লালোকে পরস্পরের পানে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষু যে উপবাসী ছিল!

দয়া বলিল—"দেখ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। খোকা এখনও এল না। কি জানি কেন মনটা এমন হয়ে গেল।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখনও খোকার আসবার সময় হয়নি। যে দিন ঘুমিয়ে পড়ে সে দিন ত আসতে দেরীও হয়। তোমার মন সেজন্তে খারাপ হয়নি। কেন হয়েছে আমি জানি।"

"কেন বল দেখি?"

"বলেছি কি না আমি পশ্চিমে যাব চাকরি করতে, তাই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।"—বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে নিজের আরও কাছে টানিয়া লইল।

দয়া একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে যেন আর তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

বাহিরে জ্যোৎস্না নিরতিশয় ম্লান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদের মুখখানিও

ম্লান হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল। গাছপালা অন্ধকারে গাঢাকা দিল। জানালা বন্ধ করিয়া উভয়ে শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে একটা আধটা পাখীর ডাক শোনা গেল। পরস্পরের বক্ষোনিবদ্ধ হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে জানালার রন্ধ্রপথে প্রভাতের আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে লাগিল। তখনও দুইজনে নিদ্রাভিভূত।

সহসা বাহির হইতে উমাপ্রসাদের পিতা ডাকিলেন,—"উমা"।

প্রথমে ঘুম ভাঙ্গিল দয়ার। সে গা ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

কালীকিঙ্কর আবার ডাকিলেন,—"উমা"। স্বরটা কম্পিত, যেন অন্যরূপ ইহা যে তাঁহারই কণ্ঠস্বর তাহা যেন কষ্টে বুঝা গেল।

এত ভোরে পিতা ত কখনও ডাকেন না। আর তাঁহার স্বরই বা এমন হইল কেন ?—তবে সত্য সত্যই খোকার কিছু অসুখ বিসুখ করিয়াছে বুঝি! উমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

দেখিল পিতার পরিধানে রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষ-মাল্য লম্বমান। এ কি! এত ভোরে তাঁহার পূজার বেশ কেন? অন্য দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তবে তিনি পূজার বেশ পরিধান করেন। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এই চিন্তাপরম্পরা উমাপ্রসাদের মস্তকে উদিত হইল।

দ্বার খুলিবামাত্র কালীকিঙ্কর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, ছোটবউমা কোথায় ?"

স্বর পূর্ব্ববৎ কম্পিত। উমাপ্রসাদ কক্ষের চারিদিকে চাহিল। দয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, কিছুদূরে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

কালীকিঙ্করও সেইদিকে নেত্রপাত করিলেন। বধূকে দেখিতে পাইবামাত্র, নিকট-বর্ত্তী হইয়া তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

উমাপ্রসাদ বিস্ময়ে বাক্যহীন। দয়াময়ী শ্বশুরের এই অদ্ভূত আচরণ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণামান্তে কালীকিঙ্কর বলিলেন—"মা আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্তু এতদিন কেন বলিসনি মা ?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা!"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা ইহাকে প্রণাম কর।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা!—আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন?"

"উন্মাদ হইনি বাবা! এতদিন উন্মাদ ছিলাম বটে। আজ আরোগ্যলাভ করেছি, সেও মার কৃপায়।"

উমাপ্রসাদ পিতার কথার কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল—"বাবা! আপনি কি বলছেন?"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা! আমার বড় সৌভাগ্য। যে কুলে জন্মেছি তা পবিত্র হ'ল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, এতদিন যে সাধনা, যে আরাধনা করলাম, তা নিষ্ফল হয়নি। মা জগন্ময়ী কৃপা করে ছোটবউমার মূর্ত্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হ'ল।"

দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে; এই দিবসত্রয়ে এ সংবাদ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশে-পাশের বহু গ্রাম হইতে বহুজন আসিয়া প্রসিদ্ধ শাক্ত-জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের বাটীতে দয়াময়ী-রূপিণী আদ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া গিয়াছে।

দয়াময়ীর রীতিমত পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ধূপ দীপ জ্বালিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা হয়। এ কয়দিনে দয়াময়ীর সম্মুখে বহুসংখ্যক ছাগবলি হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ তিন দিন দেবতার পূজা পাইয়াও দয়াময়ী কেবল কাঁদিতেছে। আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এই আকস্মিক অদ্ভূত ঘটনায় তাহাকে এমন অভিভূত বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে দুই দিন আগে এ বাটীর বধূ ছিল, শ্বশুর ও ভাসুরের সাক্ষাতে বাহির হইত না, এ সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। এখন আর তাহার মুখে অবগুণ্ঠন নাই,—যাহার তাহার পানে শূন্য-দৃষ্টিতে পাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন হইয়াছে, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে, বেশবাস সুসম্বৃত নহে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পূজার ঘরে একটি কোণে ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। পুরু কম্বলের বিছানায় রেশমী বস্ত্রের আবরণ, তাহার উপর দয়াময়ী শয়ন করিয়া আছে। গায়ে একখানি মোটা শাল। দুয়ার বন্ধ ছিল মাত্র, অর্গলিত ছিল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে দুয়ার খুলিতে লাগিল। চোরের মত সন্তর্পণে উমাপ্রসাদ প্রবেশ করিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল দিল।

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর বিছানায় আসিয়া বসিল। সে দিন উষাকালের ঘটনার পর স্ত্রীর সহিত এই তাহার প্রথম নিভৃত সাক্ষাৎ।

দয়াময়ী জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া! একি হ'ল?"

আঃ—আজ তিন দিনের পর দয়া স্বামীর মুখে একটি স্নেহমাখা কথা শুনিল। এ-তিন দিন কাল ভক্তগণের 'মা মা' শব্দে তাহার হৃদয়দেশ মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর মুখনিঃসৃত এই আদরের বাণী তাহার প্রাণে যেন অকস্মাৎ সুধা-বৃষ্টি করিয়া দিল। দয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গায়ের শাল মোচন করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিতস্বরে বারংবার বলিতে লাগিল—"দয়া! একি হ'ল—একি হ'ল?"

দয়া নির্ব্বাক্।

উমাপ্রসাদও কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তারপরে বলিল—"দয়া! তোমার কি মনে হয় যে এ কথা সত্যি? তুমি আমার দয়া নও, তুমি দেবী?"

এইবার দয়া কথা কহিল,—বলিল—"না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই,—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।"

এই কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ সাগ্রহে স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল। বলিল—"দয়া! তবে চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন কোনও দূরদেশে গিয়ে থাকব, যেখানে কেউ আর আমাদের সন্ধান পাবে না."

দয়া বলিল—"তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে যাবে?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"সে সমস্ত আমি ঠিক করব, কিছু সময় যাবে।"

দয়া বলিল—"কবে? কবে? শীগ্‌গির ঠিক কর—নইলে বেশীদিন আমি বাঁচব না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"না দয়া!—তুমি কিছু ভেবো না। দিন সাত তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক। আজ শনিবার। আগামী শনিবার রাত্রে তোমার কাছে আসব আবার—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করব। এই সাতদিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষ্মী আমার, সোণা আমার।"

দয়া বলিল—"আচ্ছা।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখন তবে যাই, কেউ আবার এসে না পড়ে"—বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে দয়াময়ীর পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামের একজন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটরান্তর্গত চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই দয়াময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—"মা! আমি চিরকাল তোমার পুজো করে এসেছি। আজ আমার বড় বিপদ মা! আজ ভক্তকে রক্ষা কর।"

দয়াময়ী বৃদ্ধের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন—"কেন দাদা! তোমার কি বিপদ হয়েছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার নাতিটি কয়দিন জ্বরবিকারে ভুগছিল। আজ সকালে কবরেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না বাঁচলে আমার বংশলোপ হবে, আমার ভিটেয় সন্ধ্যে দেবার আর কেউ থাকবে না। তাই মার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

কালীকিঙ্কর চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দয়াময়ীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা গো! বুড়োর নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে মা"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—"দাদা! তোমার নাতিকে এনে মার পায়ের কাছে ফেলে রাখ, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশ্বস্ত হইলেন। যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

একদণ্ডকাল পরে বিধবা পুত্রবধূর কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। দয়াময়ীর পদতলে বিছানা করিয়া মৃতকল্প শিশুটিকে রাখা হইল। কেবল মাঝে মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কুশি করিয়া একটু একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুখে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী, দয়াময়ীর সখী। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু ভরিল। একান্ত মনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল—"জয় মা কালী, জয় মা দয়াময়ী, মায়ের দয়া হয়েছে—মায়ের চোখে জল।" কালীকিঙ্কর দ্বিগুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভাল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মত প্রকাশ করিলেন,

আর শিশুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, স্বচ্ছন্দে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দয়াময়ীর দেবীত্ব আবিষ্কারের সংবাদ যত না শীঘ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কৃপায় মুমূর্ষ শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অতি সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতেই অপর একজন আসিয়া দয়াময়ীর চরণে নিবেদন জানাইল যে, তাহার কন্যাটি আজ তিন দিন হইতে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির,—মেয়ে বুঝি বাঁচে না। কালীকিঙ্কর বলিলেন—"তার জন্যে আর চিন্তা কি? মার চরণামৃত নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পান করিয়ে দাওগে। এখনি আরাম হবে।"

সে ব্যক্তি গলদশ্রুলোচনে দয়াময়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল, মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত সুন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ কিম্বা রাজমহল কিম্বা বর্দ্ধমান এরূপ কোনও নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিম যাইবে। অনেক দূর যাইবে;—কোথায় এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর, নয় মুঙ্গের। সেখানে চাকরির চেষ্টা করিবে। পথ-খরচের মত অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে যাহা অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন্ না দুই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে? দুই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি জুটিবে না? নিশ্চয় জুটিবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে নাকি?

এইরূপ নানা চিন্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। একদিনও ত দেখে নাই। যখন শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে পুরোহিত ঠাকুর যখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দেখিবেন যে দেবী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মত উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে

ধীরে দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কোণে সেইরূপ ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জলিতেছে। দয়াময়ীর শয্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বসিল। দয়াময়ী নিদ্রামগ্ন।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সস্নেহে দয়াময়ীর মুখচুম্বন করিল। পরে পা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া—এত ঘুম ? ওঠ, চল।"

দয়া বিস্মিতের মত বলিল—"কোথায় ?"

"কোথায় ?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা করছ কোথায় ? চল, আজ রাত্রে নৌকো করে আমরা পশ্চিমে চলে যাই।"

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। উমাপ্রসাদ বলিল—"ওঠ—ওঠ, পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিকঠাক করে রেখেছি। চল চল।"

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল।

দয়া সহসা হাত ছড়াইয়া লইয়া বলিল—'তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ করো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।"

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে বসিল। বলিল—"না না, হয় ত তোমার অকল্যাণ হবে।"

এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল—"দয়া' তুমিও পাগল হলে ?"

দয়া বলিল—"তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন ? তা হলে কি দেশসুদ্ধ লোক পাগল ?"

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল। দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা—"না না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয় ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয় ত আমি দেবী।"

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—"তুমি দেবী হলে এমন পাষাণী হতে না। এতেও তোমার মন অচল অটল রইল ?"

দয়াময়ী এইবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না।"

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর শয্যা ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মত সেই কক্ষে অস্থির-ভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বলিল—"দয়া, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল ?"

দয়া বলিল—"তা হয়েছিল বই কি!"

"তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি ত তা হলে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হল কি করে?"

এ কথার দয়া কি উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—"তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এতদিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই,—আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর!"

দয়াময়ী বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

এ কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—"চল, তবে আমরা যাই। এখানে যতদিন থাকব, ততদিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ থাকবে।"

দয়াময়ী বলিল—"তবে চল"।

খানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে পৌঁছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে। কিন্তু কিছুদুর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, "আমি যাব না।" এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়। উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্যসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। দয়া বলিল, "আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।"

উমাপ্রসাদ মর্মাহত হইয়া বলিল—"তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।"

তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহার বড়বধূ হরসুন্দরী—খোকার মা। প্রথম দুই চারি দিন তাই বড়বধূই দয়াময়ীর জুড়াবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথম যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে সে দেবী, তখন সে একদিন বড়বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল—"দিদি, আমার এ কি হল? তিনি বলিয়াছিলেন—"কি করবো বোন, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর দুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে খোকার জর

হইল। দিন দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন —"আমার বাড়ীতে স্বয়ং মার অধিষ্ঠান, কত শত দুঃসাধ্য রোগ মার চরণামৃত পান করে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হলে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে?"

বড়বধূ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—"ওগো ছেলেকে বদ্দি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না। ও রাক্ষুসি ডাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওর কি সাধ্যি!"

তারাপ্রসাদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, মাতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"খবরদার, ও কথা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা করবেন তাই হবে।"

কিন্তু বড়বধূর প্রতিদিনকার কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দনে কর্ত্তা একদিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, খোকার যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে কি?"

দয়াময়ী বলিল—"না, আমিই ওকে ভাল করে দেব।"

কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইলেন। তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।

খোকার মা একদিন একটি বিশ্বস্ত ঝিকে কবিরাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন— যাহা কিছু রোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন। ঔষধ চাই। কবিরাজ মহাশয় এ প্রস্তাব শুনিয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন—"মাঠাকুরুণকে বলিস, যখন স্বয়ং শক্তি বলেছেন তিনিই খোকাকে আরোগ্য করে দেবেন, তখন আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে অপরাধী হতে পারব না।"

যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন—"ওগো কিছু ওষুধ বলে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।" সকলেই বলে—"ওমা ও কথা বোলো না, তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ করছেন।"

খোকার ব্যারাম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দয়া বলিল, "খোকাকে এনে আমার কোলে দাও।"

খোকাকে কোলে করিয়া দয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল। খোকা অনেকটা ভাল রহিল। কিন্তু রাত্রে আবার খোকার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল।

দয়াময়ী একান্ত মনে একান্ত প্রাণে কত করিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিল, খোকার গায়ে হাত বুলাইল, কিন্তু কিছুতেই খোকা বাঁচিল না।

যখন খোকার মৃত্যুসংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইল তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া

ছুটিয়া আসিল—দয়াময়ীকে বলিল—"রাক্ষসি, খোকাকে নিলি? কিছুতেই মায়া ত্যাগ করতে পারলি নে?"

খোকার মা প্রথমে শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। যখন কতকটা সুস্থ হইল তখন দয়াময়ীকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিল। বলিল—"ও দেবী কোথায়? ও ডাইনি। দেবী কখন ছেলে খায়?"

কালীকিঙ্কর ছল ছল নেত্রে দয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হয়নি। ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।"

দয়ামমী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে যমরাজকে উদ্দেশ্য করিয়া আজ্ঞা করিল, এখনি খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হউক।

তাহাতে যখন হইল না, তখন মিনতি করিল;—আদ্যাশক্তির মিনতিতেও যমরাজা খোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না।

তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্তদিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। যেমন তেমন করিয়া আরতি হইল।

পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ!—পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

[ভাদ্র, ১৩০৬]

কাশীবাসিনী

॥ ১ ॥

দানাপুর ষ্টেশন হইতে দানাপুর সহর পাঁচ মাইল দূরে ষ্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার নাম খগোল।

খগোলের বাজার হইতে কিয়দ্দূরে, ষ্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রাথের বাসাবাড়ী। মৃন্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে তিনটি সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দা মত। তাহার পরই অন্তঃপুর। দু'খানি শয়ন ঘর, একটি রসুই ঘর, একটি

কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই) ;—উঠানটি টালি বিছানো ; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসা-যুক্ত কূপ ; মাসিক ভাড়া সাড়ে তিন টাকা।

গিরীন্দ্র চাকরিতে প্রবেশ করিয়া সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্যপানাদি যথেচ্ছাচারে কাটাইয়া, সম্প্রতি বৎসর-দুই কিঞ্চিৎ ভদ্র হইয়াছে— অর্থাৎ বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রীটি একটু বড় সড় ;—বড় সড় দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। নাম মালতী। মুখখানি বেশ লালিত্যমাখা। রঙটি তত ফর্সা নহে। এই বয়সেই বেচারি বিদেশে একাকী স্বামীঘর করিতে আসিয়াছে। শাশুড়ী নাই—ননদ নাই—দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই। স্বামী আপিস চলিয়া গেলে এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে বসিয়া মালতী দুই দণ্ড গল্প করে। সম্বলের মধ্যে এক বুড়ী দাই ভজুয়ার মা। দিনরাত্রি বাড়ীতে থাকিয়া বধূকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে—এইজন্য বেতন এক টাকা বেশী। খগোলে অনেকদিন স্থায়ী একটি বাঙ্গালী পরিবার এই দাইটিকে পুরাতন ও বিশ্বাসী বলিয়া সুপারিশ করিয়া দিয়াছেন। সে যে পুরাতন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার মস্তকের শুভ্র কেশ, দেহের স্থৌল্য, চর্ম্মের লোলতা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। এবং বোধ হয় বিশ্বাসীও বটে, কারণ বাজার করিতে যাইতে তাহার অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখা যায়। গিরীন্দ্র বেচারী অত্যন্ত ভালমানুষ ; নিজেই হাটবাজার করিয়া কুলির মাথায় দিয়া লইয়া আসে। ভজুয়ার মা ততক্ষণ বারান্দার কোণে শুইয়া নিদ্রা উপভোগ করে।

শীতকাল, তিনটা ব্যাজিয়া গিয়াছে, আর বেলা নাই। মালতী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। যথাস্থানে চট বিছাইয়া, কালো কম্বল মুড়ি দিয়া ভজুয়ার মা নাসিকাধ্বনিপূর্ব্বক মালতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। মালতী তাহার পানে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—'আঃ, হতভাগী কি ঘুমের বোঝা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল !'

এমন সময় বাহিরে একটা পুরুষকণ্ঠ 'বাবু' 'বাবু' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মালতী ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গেল। অজস্র ছিদ্রসকুল দরজাটি বন্ধ—একটি ছিদ্রে চক্ষু লগ্ন করিয়া দেখিল একজন রেলওয়ে কুলি, মাথায় একটা তোরঙ্গ, হাতে একটা পুঁটুলি—দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন বিধবাবেশিনী প্রৌঢ়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক।

চকিতের মধ্যে মালতী ফিরিয়া, দাইকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। কিছুতেই দাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় না দেখিয়া সে অবশেষে তাহার গায়ে হাত দিয়া—'আগে ভজুয়াকে মা—ঈ' বলিয়া খুব জোরে নাড়া দিতে লাগিল। দাই তখন উঠিল—শীতে

কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

এক মিনিট পরে স্ত্রীলোকটি আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। মালতীর মুখপানে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মালতী ভাবিল, স্বামীর কোনও আত্মীয়া হইবেন—কিন্তু কাহারও আসিবার কথা ত ছিল না; প্রণাম করিবে কিনা ভাবিতে লাগিল।

নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি গিরীন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

মালতী বলিল, "হ্যাঁ।"

তুমি তাঁর বউ?"

মালতী অন্যদিকে চাহিয়া, মাথা হেলাইয়া জানাইল যে তাহাই। তাহার পর সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যে চিনতে পারলাম না—কোথা থেকে আসছেন?"

"আমি আসছি কাশী থেকে। গাড়িতে যাচ্ছিলাম' টিকিট হারিয়ে গিয়েছিল তাই নামিয়ে দিলে। শুনলাম আবার সেই রাত একটায় গাড়ী। একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই—তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ী খুঁজে এলাম।"

মালতী বলিল, "তা বেশ করেছেন। হাত পা ধুয়ে ফেলুন।"

দাই জল দিল। তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। মালতী তৎক্ষণ একটি শতরঞ্চ আনিয়া বারান্দায় বিছাইল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কখন গাড়ীতে উঠে-ছিলেন? খাওয়াদাওয়া হয়নি বোধ হয়?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কই আর হয়েছে!"

মালতী দাইকে বলিল "শীঘ্র করে উনানটা জেলে দে। দিয়ে বাজার যা, আলো-চাল কিনে নিয়ে আয়।"

ইহা শুনিয়া নবাগতা সুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "না মা, আলোচাল কিনতে হবে না। আলোচাল আমার পুঁটুলিতে বাঁধা আছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। মালতীকেও কাছে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাছা?"

"আমার নাম মালতী।"

"বাপের বাড়ী?"

"উত্তরপাড়া।"

"তোমার মা, বাপ সবাই আছেন?"

মালতী মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিল, "বাবা ত মারা গেছেন আমি যখন আঁতুড়ে—মা মারা গেছেন যখন আমি এক বছরের।"—বলিয়া মালতী উঠিয়া গেল

—উনান জ্বলিতে দেরী হইতেছে বলিয়া ঝাইকে বকিল, নিজে উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

কাশীবাসিনী উঠিয়া রান্নাঘরে আসিলেন। মালতী ধৌত বস্ত্র পরিয়া রান্না চড়াইল। সেইখানেই বসিয়াই আবার গল্প আরম্ভ হইল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদ্দিন তোমার বিয়ে হয়েছে?"

"এই বোশেখ মাসে।"

"তবে ত অল্পদিনই হল। এখানে এসেছ কি মাসে?"

"এই দু-মাস।"

"তোমার স্বামী কখন আপিসে যান?"

স্বামী প্রসঙ্গে মালতীর লজ্জা হইল। মুখখানি নত করিয়া শতরঞ্চ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "নটার সময়।"

"কখন আসেন?"

"কোনও দিন ছটার সময় আসেন, কোনও দিন সাতটা বেজে যায়।"

"কত মাইনে পান?

"ত্রিশ টাকা।"

"তা ছাড়া উপরি আছে?"

মালতী লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি জানি।"

কাশীবাসিনী একটু খুসী হইলেন।

॥ ২ ॥

আজ প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ভারি সকাল সকাল যে?"

গিরীন্দ্র একটু হাসিল। বলিল, "তুমি একলাটি থাক, তাই এলাম আজ সকাল সকাল।"

মালতী বলিল, "আজ আমি ত একলা নই। আজ বাড়ীতে কে এসেছে বল দেখি?"

গিরীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে?"

"একটি বিধবা; তিনটের প্যাসেঞ্জারে কাশী থেকে দেশে যাচ্ছিলেন; টিকিট হারিয়ে যাওয়াতে নামিয়ে দিয়েছে।"

"কাশী থেকে? সঙ্গে কেউ ছিল না? কত বয়স?"

গিরীন্দ্র মালতীর অনুমান শুনিয়া হাসিল। বলিল, "ত্রিশ আর চল্লিশে কত তফাৎ, নিজের ত্রিশ বছর বয়স না হলে তা তুমি বুঝতে পারবে না।"

এ কৌতুক ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "এত লোক থাকতে আমাদের বাড়ীই কেন এল ?"

মালতী একটু থমকিয়া গেল। স্বামী বিরক্ত হইবেন তাহা ত সে একবারও ভাবে নাই, সে ত খুব আমোদ করিয়াই সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল।

গিরীন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কাশী থেকে—একলা মেয়েমানুষ—কি রকম বিধবা তাই ভাবছি !"

মালতী বুঝিল। বলিল, "না না—যা ভাবছ তা নয়। ভাল লোক।"

গিরীন্দ্র বলিল, "ভারি ত জান। যেমন তোমার বুদ্ধি! কখন যাবে বলেছে ?"

"তা ত কিছু বলেননি।"

"রাত একটার সময় আবার গাড়ী।"

"অত রাতে কি করে একলা ষ্টেশনে যাবেন ? কে পৌছে দেবে ?"

গিরীন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি পৌছে দেবো। এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল। আমি যাব—সঙ্গে করে পৌছে দেবো।"

মালতী মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিল। গিরীন্দ্র বাহিরে গিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আসিল।

এখনও মালতী সেই রকম করিয়া বসিয়া আছে। গিরীন্দ্র বলিল, "ব্যাপারখানা কি ?"

মালতী বলিল, "বাড়ীতে মানুষ এসেছে, তাড়িয়ে দেবে কি ? উনি নিজে থেকে বলেননি, কি করে বলবে যে তুমি যাও রাত একটার গাড়ীতে ?"

গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওগো সে জন্যে তোমার ভাবনার দরকার কি ? সে ভার আমার।"

ইহার পর গিরিন্দ্র তোরঙ্গ খুলিয়া একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া, একটা সোডা ভাঙ্গিয়া কয়েকবার পান করিল।

মদ্যের প্রভাবে তাহার মুখের বিরক্তির ভাব শীঘ্র অপনোদিত হইতে লাগিল। মালতীর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে গল্প আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, কাশীবাসীনী আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান হইলেন। গিরীন্দ্র হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনার আসাতে বড়ই আনন্দিত হলাম।—" বলিয়া প্রণাম করিল। 'দিল্' তখন 'দরিয়া'।

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস ?"

"আপাততঃ কাশীবাস করছি বাবা।"

"কোথা যাওয়া হচ্ছিল ?"

"একবার দেশে যাব ভেবেছিলাম—তা টিকিট হারিয়ে গেল—নামিয়ে দিলে। তাই মনে করলাম—"

গিরীন্দ্র বাঁধা দিয়া বলিল, তা বেশ করেছেন, উত্তম করেছেন। আজ এখানে থাকুন, কাল বেলা তিনটের গাড়ীতে যাবেন এখন।"

"আজ রাত একটার গাড়ীতে—"

"পাগল। অত শীতে, বুড়োমানুষ মারা পড়বেন যে! কিছু বিশেষ প্রয়োজন ত নেই ?"

"তা নেই যদিচ।"

অতঃপর গিরিন্দ্র শাল গায়ে দিয়া ছড়ি লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইল।

রাত্রি দশটার সময় ফিরিল। কাশীবাসনী তখন শয়ন করিয়াছেন। দাই নিদ্রিত, মালতীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; ডাকাডাকিতে সেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিবামাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মুখে মদের গন্ধ, কিন্তু মালতীর সেটা সহিয়া গিয়াছিল।

মালতী বলিল, "এত রাত!"

একটা ভাল খবর আছে।"

"কি ?"

"বদলি হল তাড়িঘাটে।"

"মাইনে বেড়েছে ?"

"পাঁচ টাকা।"

"মোটে!"

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে শয়নগৃহে আসিয়া পৌছিল। গিরিন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা দিক না দিক, সেখানে দু'পয়সা আছে।"

"কবে যেতে হবে ?"

"তিন চার দিন পরে।"

গিরীন্দ্র বলিল বাহিরে সে অনেক খাইয়া আসিয়াছে—আহার করিবে না। মালতী আহার করিয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী নিদ্রিত।

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় গিরিন্দ্র গাত্রোত্থান করিল। স্নানাদি করিতে আটটা বাজিল। কাশীবাসিনীকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মাগী কাল যায়নি?'

মালতী বলিল, 'বেশ! নিজে কাল মানা করলে ওকে যেতে। উনি ত একটার গাড়ীতে যেতে চেয়েছিলেন।''

গিরিন্দ্র বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল। বলিল, "আজ তিনটের প্যাসেঞ্জারের আগে কুলি পাঠিয়ে দেবো। পাপ বিদেয় ক'রে দিও। যাবার সময় সাবধানে থেক, কিছু নিয়েটিয়ে না যায়।"

মালতী ডাগর বিষণ্ণ চোখ দুটিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র আপিসে বাহির হইয়া গেলে মালতী কাশীবাসিনীকে বলিল, "আসুন আমরা স্নান করে ফেলি।"

স্নান করিতে করিতে দুইজনে অনেক গল্প হইল। বিদেশে আসিয়া অবধি মালতী একদিনও এমন করিয়া গল্প করিতে পায় নাই। ভজুয়ার মাতার সঙ্গে হিন্দী কহিয়া কহিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্নানান্তে কাশীবাসিনী আহ্নিক করিতে বসিলেন। গঙ্গাজল নাই—কূপজলেই 'ইদং গঙ্গোদকং বলিয়া সারিতে হইল।

আহারান্তে উঠানে কূপের আলিসায় বসিয়া কিয়ৎক্ষণ চুল শুকান এবং বিশ্রাম করা হইলে, মালতী চুল বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিল। এতদিন সে নিজে নিজে চুল বাঁধিয়াছে। নিজে কি ভাল করিয়া চুল বাঁধা যায়? তাহার চুলের অবস্থা দেখিয়া কাশীবাসিনী অনেক দুঃখ করিলেন। একটি ঘণ্টা ধরিয়া অতি পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন।

ক্রমে দুইটা বাজিল। এইবার কুলি আসিবে। কাশীবাসিনী প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, "মা, একদিনেই তোমার উপর মায়া জন্মে গেছে। যেতে কষ্ট হচ্চে।"

মালতীরও সেইরূপ বোধ হইতেছিল। বিদেশে কতদিন পরে একজন রমণীর স্নেহ-ব্যবহার পাইয়া তার যেন পরমাত্মীয় লাভ হইয়াছে মনে হইতেছিল। ইনি চলিয়া গেলে আবার সেই সারাদিন ধরিয়া একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহারও বড় কষ্ট হইতে লাগিল।

মালতী বলিল, "আজ নেই বা গেলেন! দু'দিন থাকুন না। এ দু'দিন আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বেঁচেছি। একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এক এক সময় কান্না পায়।

কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু বাছা তোমার স্বামী কিছু ভাবেন যদি ?"

মালতী মুখে বলিল, "ভাববেন আবার কি ?"—কিন্তু মনটি তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সত্যই ত, স্বামী যে, ইহার উপর প্রসন্ন নহেন। কুলিটা আসিলে অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বামী পাছে বেশী রাগ করেন ?

তাহার পর ভাবিল—তা করেন, করিবেন। এমন কিছু গর্হিত কার্য্য করা হইতেছে না। আমি এই একলাটি এই সংসার ঘাড়ে করিয়া মরিতেছি, কেহ আহা বলিবার নাই, কথা কহিবার একটা মানুষ নাই—আমি একজন লোককে দুইদিন রাখিতে পারি না ?—স্বামী আসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে মালতী কি কি বলিবে, কি রকম করিয়া রাগ করিবে, সব মনে মনে পড়িয়া রাখিতে লাগিল।

দুইটা বাজিল, কুলি আসিল না। তিনটা বাজিয়া গেল, কুলির দেখা নাই। মালতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—তখন আবার মনের সুখে কাশীবাসিনীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

বৈকালে মালতী জলখাবার কিনিতে দাইকে বাজারে পাঠাতেছিল, কাশীবাসিনী বলিলেন, "ছাইপাঁশ বাজারের জলখাবারগুলো কেন খাও তোমরা ? ঘরে খাবার তৈরী করতে জান না ?"

মালতী বলিল, "কে অত হাঙ্গামা করে বাপু !"

"হাঙ্গামা আবার কি ? আমি তোমায় আজ দেখিয়ে দিচ্চি।"—বলিয়া তিনি দাইকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিজের বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুজি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি কিছু কিছু আনিবার আদেশ করিলেন।

মালতী বলিল, ও কি কথা ! আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন ? আমি টাকা দিই।" দাইকে বলিল, টাকা ফিরিয়ে দে দাই।"

দাই টাকাটি কাশীবাসিনীর হাতে দিতে গেল—তিনি কিছুতেই লইবেন না। বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্য একটা টাকা খরচ করলামই বা ; তোমরা আমায় কত যত্ন আদর করছ।"

মালতী বলিল, "ভারি আদর ভারি যত্ন করেছি আপনাকে কিনা। আদর যত্ন করতে জানি কিনা ! নিন টাকাটা রাখুন।"

তিনি বলিলেন, "দেখ বাছা, তা হলে কিন্তু আজই রাত্তির একটার গাড়ীতে চ'লে যাব।"

তখন মালতী ক্ষান্ত হইল। বলিল, "কর বাছা তোমার যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু

অন্যায় হল ব'লে রাখছি।"

দাই টাকা লইয়া বাজারে গেল।

।। ৩ ।।

আজ গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল অনেক বিলম্বে; রাত্রি প্রায় তখন আটটা। আসিয়া কাশীবাসিনীকে বলিল "আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে। আপিসে কাষের ভিড়ে আপনাকে নিতে কুলি পাঠাতে একেবারেই মনে ছিল না। দু' দিন যখন কষ্ট পেলেন, আর একটা দিন তখন কষ্ট করুন। কাল আর আমার আপিস নেই, কাল নিজে গিয়ে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবো।"

মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার মুখে মদ্যগন্ধ পাইল। বলিল, "তোমার গতিক ভাল নয়। ভাড়িঘাটে গেলে হাতে বেশী পয়সা পেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে।"

গিরীন্দ্র বলিল, "আরে রামঃ, সে ছোট ষ্টেশন, অজ পাড়াগাঁ, সেখানে কি কেলনার কোম্পানি আছে? সেখানে গিয়ে, গঙ্গাস্নান ক'রে, সব ছেড়ে দেব—ব্যাস একদম।"

"তুমি কাল আপিসে যাবে না?"

"না, আমার এখানকার সব কাষ শেষ হয়ে গেছে। বাবুরা ধরেছে পরশু ভোজ দিতে হবে। কাল সব যোগাড়যন্ত্র ক'রে রাখতে হবে।"

গিরীন্দ্র হস্তপদাদি ধৌত করিয়া আসিয়া বলিল, "আজ আর জলখাবার খাব না, কোথাও বেরুব না; রুটি দাও একেবারে খাই।

মালতী লুচি, মোহনভোগ, মাছের তরকারী প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ যাহা কাশী বাসিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সমস্ত আনিয়া দিল। গিরীন্দ্র আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। বলিল, "দেখ, উনি মাংস রাঁধতে জানেন কিনা জিজ্ঞাসা কর দিকিন।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল, "জানেন কিছু কিছু।"

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। ওঁকে যদি দুই একদিন থাকতে বলা যায়, উনি থাকেন না? তা হলে পরশু ভোজ পর্য্যন্ত ওঁকে রাখা যাক। একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

মালতী মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, "তুমি জিজ্ঞাসা কর না।"

গিরীন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিল, "এ অবস্থায় কি ওঁর সঙ্গে কথা কইতে পারি?"

মালতী বলিল, "আহা মরে যাই! আজ বাড়ী এসেই ওঁর সঙ্গে কথা কইলে না?"

—বলিয়া কাশীবাসিনীর কাছে গিয়া প্রস্তাবটা করিল। তিনি সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গিরীন্দ্র ভোজের জিনিসের ফর্দ্দ করিল। কাশীবাসিনী তাহা শুনিয়া যে সকল মন্তব্য ও পরিবর্ত্তনাদি প্রস্তাব করিলেন তাহা গিরীন্দ্রের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। আড়ালে মালতীকে বলিল, "দেখ ইনি একজন খালিফা লোক! কাশীতে শুধু ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে কোরো না।"

মালতী রাগ করিয়া বলিল, "কি বল যাও! তোমার মন ভারি অশুদ্ধ।"

দুই ক্রোশ দূরে গুরগাঁও পল্লীতে দেবী আছেন। পরদিন প্রভাতে সেইখানে ছাগবলি পাঠান হইল।

রাত্রিকালে ভোজের ব্যাপার—নির্বিঘ্নে বলিতে পারি না—সম্পন্ন হইয়া গেল। রন্ধনাদি চমৎকার হইয়াছিল। যদি ভোক্তারা সকলে সচেতন থাকিত, তবে সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে পারিত।

॥ ৪ ॥

আজ রবিবার। আজ রাত্রের গাড়ীতে গিরীন্দ্র তাড়িঘাট যাত্রা করিবে। কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি আর দেশে যাব না—আমিও কাশীতেই ফিরে যাই।"

মালতী বলিল, "বেশ ত, আপনিও আমাদের সঙ্গেই চলুন। তাড়িঘাট থেকে চার পাঁচটা ষ্টেশন বইত নয়।"

আহারান্তে গিরীন্দ্র মালতীকে বলিল, "গোটা টাকা বের ক'রে দাও—বাজার দেনাগুলো মিটিয়ে আসি।"

মালতী বলিল, "অবাক কথা! আমার কাছে আর টাকা আছে নাকি?

"কেন সে দিন যে আশি টাকা এনে দিলাম।"

"পরশু বাজারে যাবার সময় ত্রিশ নিয়ে গেলে, বাকী যা ছিল কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে সে সবই ত প্রায় দিলাম তিন চার বারে। আর টাকা কোথায়?"—বলিয়া মালতী বাক্স খুলিয়া দেখিল, দুই টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র রহিয়াছে।

গিরীন্দ্র বলিল, "এখন উপায়? আমার কাছে ত কিছু নেই!

মালতী চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "আমি কি করব? মদেই তোমার সর্বনাশ করলে। সে সময় ত জ্ঞান থাকে না, তখন কেবল দাও টাকা দাও টাকা বল।"

গিরীন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দেখি কারু কারু কাছ থেকে ধার নিইগে।"

কাশীবাসিনী বাহিরে বসিয়া সব কথা শুনিয়াছিলেন। মালতীকে ডাকিয়া

বলিলেন "ওঁকে বারণ কর মা আমার কাছে টাকা রয়েছে আমার ত এখন দেশে যাওয়া হল না।"

মালতী গিয়া স্বামীকে বলিল। গিরীন্দ্র বলিল, "সে কি কাষের কথা? ওঁর কাছে টাকা নেব, আলাপ নেই পরিচয় নেই!'

কাশীবাসিনী এ কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "তাতে আর ক্ষতি কি বাবা? তোমরা তাড়িঘাটে গিয়ে থিতু হয়ে বস; আমি কিছুদিন পরে আবার আসবো এখন তোমাদের কাছে; দেখাশুনাও হবে, টাকাও নিয়ে যাব।"

গিরীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তা হলে আপনি অনুগ্রহ ক'রে কাশী না গিয়ে আপাততঃ তাড়িঘাটেই চলুন আমাদের সঙ্গে। পাঁচ ছ' দিনেই আপনার টাকা ক'টি ফিরে দিতে পারব।"

"আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। কত চাই? তিরিশ? যদি বেশী দরকার থাকে তাও আমার কাছে আছে, যা লাগে বল বাবা।"

গিরীন্দ্র বলিল, "না মা বেশী চাইনে, ত্রিশ দিলেই হবে।"

কাশীবাসিনী বাক্স খুলিয়া দশ টাকার তিনখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সেইদিন রাত্রি এগারটার গাড়ীতে গিরীন্দ্রনাথ, স্ত্রী ও কাশীবাসিনীকে লইয়া যাত্রা করিল। ভজুয়ার মা কাঁদিতে লাগিল। গিরীন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না।

ষ্টেশনের পথে কাশীবাসিনী মালতীকে বলিলেন, "বাছা, বাবাকে বল যেন আমার কাশীর টিকিটই করেন। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

গিরীন্দ্র ইঁহাকে তাড়িঘাটে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিল, কিন্তু ফল হইল না।

তাড়িঘাটে যাইতে দিলদারনগরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। গিরীন্দ্র ভোর রাত্রে স্ত্রীকে লইয়া দিলদারনগরে নামিয়া গেল;—কাশীবাসিনী চলিয়া গেলেন।

॥ ৫ ॥

বেলা সাতটার সময় গিরীন্দ্রনাথ নূতন কর্ম্মস্থান তাড়িঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। সরকারী বাসা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইখানে গিয়া উঠিল। জিনিষপত্রগুলা কতক গুছাইয়া ষ্টেশনে বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

মালতী স্নান করিবে বলিয়া কাপড় বাহির করিবার জন্য একটা তোরঙ্গ খুলিল। সচরাচর তাহার গহনার বাক্সটি এই তোরঙ্গের মধ্যেই থাকিত। কাপড় বাহির করিতে গিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, গহনার বাক্স নাই।

তখন মালতী ভাবিল, নিশ্চয়ই অন্য কোন বাক্সে আছে। যতগুলি বাক্স আছে একে একে সমস্ত খুলিয়া খুঁজিল, কোথাও নাই।

মন বোঝে না, দুইবার—তিনবার করিয়া প্রত্যেক বাক্সটির প্রত্যেক জিনিষ আলাদা আলাদা করিয়া খুঁজিল, তথাপি পাইল না তখন সে হতাশ হইয়া ধূলায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিল। ষ্টেশনমাষ্টারের মেয়ে চম্পকলতা তাহার ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া 'বউ দেখিতে' আসিয়াছিল, সে মালতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চম্পট দিল।

শেষে গিরীন্দ্র আসিল। সে দেখিয়া বলিল, "এ কি!"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিল।

শুনিয়া গিরীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল, "বেশ ক'রে সব খুঁজেছ?"

"কিছু বাকী রাখিনি"

"শেষ তাকে কখন দেখেছ?"

"কাল খগোলে গুছিয়ে একখানি শালুর টুক্‌রোতে বেঁধে ঐ কালো তোরঙ্গের মধ্যে রেখেছি, বেশ মনে পড়ছে।"

"গাড়ীতে কালো তোরঙ্গ খুলেছিলে? কোন জিনিষপত্তর বের করতে?"

"খুলেছিলাম একবার। শীত করতে লাগল, শালটা বের করেছিলাম।"

"সে সময় গহনার বাক্স বের ক'রে ফেলে রাখনি ত?"

মালতী বলিল, "কথখনো না। উপরে শালখানা ছিল—শুধু তয়ে তয়ে শাল তুলে নিয়েছি।"

"চাবি কোথা রেখেছিলে?"

"কোমরে ছিল।"

"তারপর ঘুমিয়েছিলে?"

"তা, ঘুমোলাম বই কি।"

গিরীন্দ্র নিশ্চিত স্বরে বলিল, "তবে কাশীর সেই মাগী নিয়েছে।"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র বলিতে লাগিল, "যখন ঘুমিয়েছিলে, তখন আস্তে আস্তে কোমর থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে, গহনার বাক্সটি বের করে নিয়েছে। তার নাম কি জান?"

"না। বুড়ো মাগীর নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কখনও?"

"কাশীতে কোথায় থাকে জান ?"

"কি একটা মঠে।"

গিরীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "কাশীতে ত দুশো ছাপান্নটা মঠ আছে—কোন্ মঠে—কোন্খানে সে মঠ কিছু শুনেছ?"

"না।"

"সেইকালেই বলেছিলাম, ও সব লোককে বিশ্বাস করো না ওরা সর্ব্বনেশে লোক—কাশীর ঘাগী বেশ্যা। ত্রিশ টাকার চার ফেলে যথাসর্ব্বস্বটা নিয়ে গেল !"

মালতী বলিল, "তিনি কখখনো নেন নি। তিনি নেবেন কেন ? আমিই বোধ হয় খগোলের বাসায় ফেলে এসেছি "

গিরীন্দ্র কিন্তু তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। বলিল, "ও সব কথা রেখে দাও—জান না ত পৃথিবীর গতিক। আচ্ছা সে মাগী কোনও দিন তোমার গহনা দেখতে চেয়েছিল ?"

মালতী ভয়ে ভয়ে বলিল, "তা চেয়েছিলেন ; সেই ভোজের দিন। বললেন, মা তোমার কি কি গহনা আছে দেখি।—আমি বের ক'রে সব দেখালাম।"

গিরীন্দ্র বলিল, "তবে আর কোনও সন্দেহ নেই। আমি চললাম পুলিশে টেলিগ্রাফ করতে।"—বলিয়া গিরীন্দ্র ষ্টেশনে গেল।

মালতী আবার একা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

॥ ৬ ॥

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহে এই দম্পতী গহনার শোক প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বমত হাসে, গল্প করে, আমোদ করে। নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি গিরীন্দ্র বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতেই বোধ হয় গহনা লোকসানের কষ্ট অনেকটা চাপা পড়িয়া গেল।

যে দিন পুলিশে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল, সেই দিনই দিলদারনগর হইতে হেড কনষ্টেবল আসিয়া গহনাগুলির ফর্দ ও বিবরণ গিরীন্দ্রনাথের জবানবন্দীসহ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে পুলিশের তরফ হইতে আর কোনও সংবাদ নাই।

বেলা সাড়ে এগারোটা ; গিরীন্দ্রনাথ আপিসে গিয়াছে। মালতী খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় দিলদারনগর হইতে গাড়ী আসিল। গিরীন্দ্রনাথের বাসা প্লাটফর্ম্মের নীচেই, দুয়ারে দাঁড়াইলে প্লাটফর্ম্ম, গাড়ী লোকজন সব দেখা যায়। যতবার গাড়ী

আসিত, ততবার মালতী দেখিতে ছুটিত, প্রতি গাড়ীটি না দেখিলে যেন তাহার কর্ত্তব্যের হানি হইবে। গাড়ীর শব্দ শুনিবামাত্র মালতী থালা ফেলিয়া এঁটো হাতে এঁটো মুখে গাড়ী দেখিতে গেল। বন্ধ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ফুটা দিয়া দেখিল, প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কাশীবাসিনী নামিয়াছেন, একটা কুলি তাঁহার জিনিষ নামাইতেছে; তিনি কুলিকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলিটা গিরীন্দ্রনাথের বাসার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

মালতী ছুটিয়া উঠানে গিয়া আচমন করিল। কম্পিত বক্ষে কাশীবাসিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কত কি যে তাহার মনে হইল! কত আহ্লাদ হইল, আর কতবার মনে মনে বলিল, হে ঠাকুর, স্বামী যে তাঁহাকে গহনা চুরির অপবাদ দিয়াছেন সে কথা যেন উহার কর্ণগোচর না হয়।—তিনি যে গহনা লন নাই এই বিশ্বাস মালতীর ছিল। আসিতে দেখিয়া সে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। নহিলে কখনও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হন?

কয়েক মিনিট পরে কাশীবাসিনী মালতীর নিকটে পৌঁছিলেন।

"মা এসেছেন?"—বলিয়া মালতী প্রণাম করিল। তিনি মালতীকে মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মালতী বলিল, "আপনি স্নান করে ফেলুন, আমি ভাত চড়িয়ে দিই।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "স্নান করেছি। ভাত চড়াতে হবে না—আজ একাদশী।"

মালতী লক্ষ্য করিল, কাশীবাসিনীর মুখখানা যেন বড় গম্ভীর—বিষণ্ণ। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যে ছলছল করিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মনটা এত ভার ভার কেন?"

তিনি বলিলেন, "জান না?"

মালতী ভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"তোমাদের সন্দেহ, আমি তোমার গহনার বাক্স নিয়ে গেছি, পুলিশ পাঠিয়েছ, জান না?"

মালতী লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি যদি বলি, আমার মনে একদিনও এ সন্দেহ হয়নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি?

কাশীবাসিনী ম্লান মুখে বলিলেন, "তোমার স্বামীর ত বিশ্বাস হয়েছিল বাছা!

মালতী বলিল, "পুলিশ আপনার সন্ধান পাবে তা উনি ভাবেন নি। উনিত আজও বলছিলেন, কাশীতে কত লক্ষ লক্ষ মঠ, কোটি কোটি সেবাধারী, কে কার

সন্ধান পায় ?”

“বের ত করেছিল আমায়। আমার উপর জুলুমটা কি করেছে কম ? ছুটিশো টাকা নগদ ঘুস গুণে দিয়ে তবে নিস্কৃতি পেয়েছি।”

মালতী বলিল, “আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হল।”

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “গিন্নীন কখন আসবেন ?”

“সন্ধ্যেবেলা।”

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?”

“আজই যাব।”

“আজই যাবেন ?”

কাশীবাসিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি ভারি ছেলেমানুষ! তোমার স্বামী আমাকে চোর বলে সন্দেহ করেন, আর তোমার ইচ্ছে যে আমি থাকি! আমি আড়াইটের গাড়ীতে ফিরব। আমাদের আরও অনেক লোক শ্রীক্ষেত্র যাচ্চে। কাল আমরা সবাই রওনা হব।”

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, “কতদিনে ফিরবেন ?”

“কেন ? ফিরলে কি দেখা হবে ?”—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনীর চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “একটি কায করবে ?”

মালতী সাগ্রহে বলিল, “কি”

“আমার কতকগুলি গহনা আছে, সেগুলি তুমি পর দিকিন!”—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনী তাঁহার সঙ্গের তোরঙ্গটি খুলিয়া একটি হাতবাক্স বাহির করিলেন। মালতী বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার ভিতর বিস্তর গহনা, ভাল ভাল জড়োয়া গহনা।

কাশীবাসিনী বলিলেন, “এইগুলি সব তুমি নাও।”

সোণা, রূপা, হীরা, মোতি, চুনী, পান্নার চাকচিক্যে মালতীর চক্ষু ঝলসিত। তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, “সে আমি পারব না।”

“কেন ?”

“আপনার এই রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব ?”

“আমি দিচ্চি”

“আপনি দিচ্চেন, কিন্তু আমি কোন অধিকারে নেব ? সে আমি পারব না।”

আকাশে মেঘ বাড়িয়া উঠিল। ঝড় উঠিল। দিবালোক অত্যন্ত কমিয়া গেল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধিকার যদি থাকে ?"

মালতী বলিল, "অধিকার ? কি অধিকার ?"

কাশীবাসিনী মুখখানি নীচু করিয়া বলিলেন, "তা বলব, তা বলতেই আজ এসেছি।"

মালতীর বুক গুরুগুরু করিয়া উঠিল। অবাক হইয়া সে কাশীবাসিনীর মুখপানে চাহিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কি সত্যি মরেছে ?"

মালতী থতমত খাইয়া বলিল, "কেন ?"

"তাই জিজ্ঞাসা করি।"

"সবাই ত বলে।"

"তা হ'লে তুমি জান। আমিই তোমার পোড়ামুখী মা।"—বলিতেই কাশীবাসিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল।

মালতী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অল্পদিনের ঘটনা সে ভাবিতে লাগিল। মোক্ষদা ঠানদি তীর্থ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে রাত্রে শুইয়া শুইয়া তার জ্যেঠাইমার সঙ্গে অনেক কথা বলাবলি করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন মালতী ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মালতী ঘুমায় নাই, সব শুনিতে পাইয়াছে। যাহা শুনিল, তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যেন তার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। যে মাকে এতদিন স্বর্গগতা জানিত, শুনিল তিনি বাস্তবিক জীবিতা, তাঁহার সহিত ঠানদির কোন্ তীর্থে হঠাৎ দেখা হইয়াছে। জানিল, যে মার স্মৃতি সে পবিত্রতম বলিয়া পরম ভক্তিভরে আশৈশব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—সে মার স্মৃতি সংসারে ঘৃণিত, মা তার কলঙ্কিনী। তাহার সে রাত্রের কষ্ট অবর্ণনীয়। এই সেই মা? আবার সেই রাত্রের তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল।

মালতী শিহরিয়া উঠিল, অজ্ঞাতসারে একটু দূরে সরিয়া বসিল।

কাশীবাসিনী তখনও কাঁদিতেছিলেন। একটু আত্মস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই জানেন ?"

"না।"

"তুমি কতদিন হল শুনেছ ?"

"বিয়ের পর।"

"মোক্ষদাপিসীর কাছে ?"

"হঁ্যা।"

"মোক্ষদাপিসীর মুখেই শুনলাম, তোমার বিয়ে হয়েছে, দানাপুরে মালঘরে জামাই কর্ম করেন, পূজোর সময় তুমি দানাপুরে আসবে তাও ঠিক হয়েছে।"

মালতী বলিল, "তা হলে দানাপুরে তুমি হঠাৎ এসে পড়নি, জেনে শুনে এসেছিল ? কেন ?"

মালতীর স্বর এখন কঠোর।

কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনার সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পারে ?"

মালতীর একবার একটু একটু কান্না আসিতে লাগিল। আপনার মা না জানিয়াও ইঁহার যে মাতৃবৎ আবর্ষণ হইয়াছিল, তাই মনে পড়িল। কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল, "কেন তুমি জানালে তুমি কে ?"

"কি জানি। থাকতে পারলাম না।"

মালতী আবেগভারে একবার বলিতে যাইতেছিল—জানিয়েচ ভালই করেছ। নইলে মা ত কখনো চক্ষে দেখতে পেতাম না!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, 'এ মা! নাই দেখতাম।"

এই দ্বিধায় সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর সময় হইল। কাশীবাসিনী কুলিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে জিনিস লইতে-আসিল।

মালতী বলিল, "গহনা নিয়ে যাও। আমি পরব না।"

কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, "যা ভেবেছে তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চৌদ্দ বছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর এর, একখানিও পাপের অর্জ্জন নয়। আমি মস্ত বড় মানুষের মেয়ে ছিলাম—শোননি ?"

মালতী বলিল, "তবুও আমার স্বামীকে সব না জানিয়ে, তাঁর মত না নিয়ে, আমি নিতে পারিনে।"

"তাই কোরো। যদি তিনি তোমায় পরতে না দেন, তবে এগুলি দেবসেবায় দিও।"

তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন।

মালতী আর থাকিতে পারিল না। "মা আবার দেখা দিও"—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।

"সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও"—বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া, দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

[বৈশাখ, ১৩০৮]

প্রণয়-পরিণাম

॥ ১ ।

হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাণিকলাল, প্রতিবেশী বালিকা কুসুমলতার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন—কে এমন প্রেমিক আছে, যে প্রথম দর্শনেই ভালবাসে নাই?'—কেন, আমাদের মাণিকলাল! কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে, গাছের মগডালে উঠিয়া তাহাকে ছানাসুদ্ধ পাখীর বাসা পাড়িয়া দিয়াছে, ঘোড়া সাজিয়া পৃষ্ঠে তাহাকে বহন করিয়াছে, কিন্তু তখন ত সে কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই। কে জানে, হয়ত সে মনের মনে, হৃদয়ে হৃদয়ের ভালবাসিত, অন্তরের সুগোপন অন্তরালে সে প্রচ্ছন্ন প্রবাহের অস্তিত্ব নিজেও অবগত ছিল না।

মাণিকলাল নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িয়াছে সংপ্রতি মাত্র। সেদিন মাণিক কুসুমদের বাগানে, পেয়ারা পাড়িতে গাছে উঠিয়াছিল। কুসুম মাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কুসুমের পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত, পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাজির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোণালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। দেখিয়া, মাণিক হৃদয় হারাইল।

ইহারা চলিয়া গেলে পর, মাণিক তাহার অন্তরে যেন এক অপূর্ব্ব আলোকের রশ্মি প্রতিভাত দেখিল। সে আলোক তাহার মনোদেহের প্রতি পরমাণুটিকে যেন বেষ্টিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলোক মন অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহার চক্ষুযুগলে আসিয়া উপনীত হইল এবং নিমেষের মধ্যে নিখিল বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই নবীন আলোকে মাণিক আকাশের পানে চাহিল—আকাশ আশ্চর্য্য নীল—এমন কখনও দেখে নাই।—বসুন্ধরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বসুন্ধরা আজ পরম সুন্দরী। দূরে দীর্ঘিকাতীরে ঘুঘু ডাকিতেছে—উকু পাখী কলরব করিতেছে, বউ-কথা-কও মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে; পাখীর ভাষায় যেন আজ নূতন প্রাণ, নূতন সুর। মাণিক নিশ্বাস ফেলিয়া,

গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া, বাকী সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেষতঃ কোবো পেয়ারায়—আর তাহার চিত্ত নাই।

সেদিন রবিবার ছিল—স্কুল যাইতে হইবে না। আহতবৎ মন্থরপদে বাড়ী আসিয়া মাণিক পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। পড়িবার জন্ত? হায়, না, পুড়িবার জন্ত, চিন্তার অনলে নিজের হৃদয়কে আহুতি দিবার জন্ত। শতরঞ্জ বিছান মেঝেতে ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি মাথায় দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

মাণিকের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। এই বয়সেই সে বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছে রাশি রাশি। 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' হইতে আরম্ভ করিয়া, বটতলায় 'পারুলবালা', 'সোহাগিনা', 'বউরাণী' প্রভৃতি কিছুই আর বাকী নাই।

শুইয়া শুইয়া মাণিক আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দুঃখ যেন তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে। 'কেন দেখিলাম! হরি হরি কি দেখিলাম! দেখিলাম ত মরিলাম না কেন? আমার মনে এ আগুন—এ কুলকাঠের আঙার—কে জ্বালিল রে? নিবিবে কি? কতদিনে—হায় কতদিনে? —ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিশ দিতে দিতে লম্ফ দিয়া মাণিকের সহপাঠী বন্ধু বিপিন ও শরৎ প্রবেশ করিল। বিপিন আসিয়া একেবারে মাণিকের চুল ধরিয়া বলিল, "কি রে ইষ্টুপিট্ ঘুমুচ্ছিস নাকি? মার্বেল খেলবিনে?"

মাণিক উঠিয়া বিপিনের গালে হঠাৎ এক চড় কসাইয়া দিল।

বিপিন হতভম্ব। শরৎ বলিল, "তোর হয়েছে কি? মারামারি করতে চাস, আয়"—বলিয়া শরৎ আস্তিন গুটাইতে লাগিল!

বিপিন বলিল, "আঃ শরতা কি করিস।" মাণিকের পানে ফিরিয়া বলিল, "লেগেছে ভাই, রাগ করেছিস?"

মাণিক বলিল, "মানুষ শুয়ে রয়েছে, চুল ধ'রে টানলি কি ব'লে?"

শরৎ মাণিকের চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল—"আহা এ রকম করে টানলে বুঝি আবার লাগে?"—তাহার আশা ছিল, তাহাকেও মাণিক চড় মারিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শরৎ তাহার সহিত ঘুঁসি লড়িতে আরম্ভ করিবে।

কিন্তু শরতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। মাণিকের ক্রোধ নিরীহ বিপিনের উপরেই সবটা খরচ হইয়া গিয়াছিল। মাণিক সটান আবার শুইয়া পড়িল।

শরৎ বলিল, "না খেলিস—না খেলবি। ভারি ত বয়েই গেল কিনা।" বলিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ রে বিপনে।"

বিপিন যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'মাণিক রাগ করিসনে ভাই—যদি গেলে থাকে তোর, বিলক্ষণ শোধ ত নিয়েছিস।"

॥ ১ ॥

মাণিক আর ফুটবল খেলে না—জিম্ন্যাষ্টিক্ করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে—দ্বিপ্রহরে ইস্কুল পলাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া কবিতা লেখে। প্রভাতে, সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ী গিয়া কুসুমকে দেখিয়া আসে।

কুসুম মেয়েটি দেখিতে খুব সুন্দরী না হউক, মুখখানি বেশ ফুটফুটে। পিতামাতার শেষের সন্তান—ভারি আদরের মেয়ে। কুসুম এই কার্ত্তিক মাসে এগারো বছরে পড়িয়াছে। দুই এক স্থানে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে, কিন্তু এখনও পাকাপাকি কোথাও স্থির হয় নাই।

মাণিক ক্রমাগত কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া, কথা কহিয়া, জিনিষ দিয়া তাহার সঙ্গে একটু বেশ ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। মাণিকের প্রতি কুসুমেরও একটা টান যেন দেখা যাইতে লাগিল।

বৈশাখের শেষে, কলেজ বন্ধ হওয়াতে মাণিকের এক পিসতুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মাণিক অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে কতকটা গুরুজন বলিয়া গণ্য করিত এবং ভয় করিয়া চলিত। প্রভাস আসিলেই মাণিককে পড়া জিজ্ঞাসা করিত, আঁক কষিতে দিত, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, অসৎসঙ্গের দোষ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশাদি দিত।

কিন্তু কলিকাতায় বন্ধুগণের মধ্যে প্রভাস একজন নীরব কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমান্স কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোনও মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।

সে আসিয়া মাণিকের ভাবগতি দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি?

মাণিক ত কিছুই স্বীকার করে না। সন্ধান করিয়া করিয়া শেষে একদিন প্রভাস মাণিকের কবিতার খাতা হাতে পাইল। কবিতা পড়িয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। মাণিকের উপর তাহার ভারি ভক্তি ও সৌহার্দ্দ্য বোধ হইল।

সেদিন জলখাবার খাইয়া প্রভাস মাণিককে বলিল, "গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক চল।"

মাণিক প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল—কিন্তু প্রভাস অনেক জিদ্‌ করিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া, তীরে উঠানো এক ভাঙ্গা নৌকার গায়ে দুইজনে উপবেশন করিল।

প্রভাস বলিল, "আমি সব জানতে পেরেছি।"

মাণিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি?"

"তোমার গোপন কথা।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই সিগারেটের বিষয়। ডেস্কের মধ্যে লুকানো বার্ডসাই, কাগজ প্রভৃতি প্রভাসদাদা বোধ হয় দেখিতে পাইয়াছে, সুতরাং সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "বেশী চালাকী কোরো না যাও।"

প্রভাস বলিল, "এ চালাকির কথা নয়—খুব গুরুতর কথা। জীবন মরণের সমস্যা।

এবার মাণিক যথার্থ বিষয়টি সন্দেহ করিল। বলিল, "কি হয়েছে কি? কি বিষয় বলই না।"

প্রভাস দূরস্থিত মৃত্যুগামী নৌকার পানে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, "তোমার ভালবাসার বিষয়।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই বাবাকে বলিয়া দিবে এবং মার খাওয়াইবে, সুতরাং শত্রুভাব ধারণ করিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "আহা যা বলে আর কি! ইয়াকি ভাল লাগে না।"

প্রভাস বলিল, 'ভাই—আমার কাছে আর লুকাও কেন? আমি সব জেনেছি। তোমাদের দুঃখে আমি খুব দুঃখী। তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি।"

মাণিক কতকটা আশ্বস্ত হইল। একটু অপ্রতিভও হইল। বলিল, "কে বললে তোমায়?"

নৌকার গায়ে জুতার গোড়ালি ঠুকিতে ঠুকিতে প্রভাস বলিল, "তোমার কবিতার খাতা দেখেছি। আমাদের অতুল বাঁড়ুয্যের মেয়ে কুসুম ত?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাই বটে।

"তোমার কবিতা থেকে যেন বোঝা যাচ্চে, আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল—তাই কি?"

মাণিক বলিল, "মনে ত হয়।"

"স্পষ্ট কখনও বলেছে?"

"না।"

"তুমি কখনও তাকে স্পষ্ট করে বলেছ ?"

"না।"

ইহার পর দুজনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে প্রভাস বলিল— "দেখ ওরা আমাদের স্বঘর। মিলন হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু মা বাপকে জানানোর আগে, কুসুমের মন জানা দরকার। অনুমান কনুমান নয়, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

মাণিক, বলিল, "সে কখনও পারা যায় ?"

প্রভাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে না পারলে চলবে কেন ? তুমি যদি সত্যই ওকে লাভ করতে চাও, তা হলে এ বিষয়ে যা কিছু কর্ত্তব্য, সব তোমায় সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে কি ক'রে হবে ? আর দেরী করলেও চলবে না। কুসুমের কত জায়গায় বিয়ের কথা হচ্চে, কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যাবে। তখন চিরদিনটে তোমায় আপশোষ করতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতদিন সে শুধু ভালই বাসিতেছিল। বিবাহ প্রভৃতির কল্পনা কখনও করে নাই। এখন মনে হইতে লাগিল, বিবাহ হইলে ত ভারি মজাই হয়!

"দাদা কি ক'রে তার কাছে কথা পাড়ি বল দিকিন ?"

"তা আমি শিখয়ে দিচ্চি। একটু অবসর খুঁজে আড়ালে পেলে, তার হাতখানি এমনি করে ধরে, তাকে বলবে—'দেখ কুসুম—আমি তোমায় ভালবাসি। একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি, তুমি আমাকে ভালবাস কি ?' 'যদি বলে 'বাসি'—তা হলে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি আমার হবে কি—আমায় বিয়ে করবে কি ?' যদি সে অনুকূল উত্তর দেয়—তা হলে তার হাতটি এই রকম করে ঠোঁটে তুলে চুমো খাবে।"

মাণিক বলিল, "কিন্তু দাদা! সে যদি রাজি না হয় ?"

প্রভাস বলিল, "তা প্রথমবারেই রাজি নাও হতে পারে। ও রকম অনেক কেতাবে পড়া গেছে। প্রথমবারে কেউ কেউ একেবারেই 'না' বলে। কেউ কেউ বা বলে— 'ভারি সহসা বলেছ, সময়ে উত্তর পাবে'। যে রকম হয়—তখন আবার তোমাকে শিখিয়ে দেবো।"

চাঁদ উঠিয়াছিল। দুইজনে নানা জল্পনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

॥ ৩ ॥

পরদিন হইতে মাণিকলাল অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েকদিন চেষ্টার

পর তাহা লাভও করিল। একদিন সকালে কুসুমদের বাড়ী গিয়া দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই, কুসুম রান্নাঘরের বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে।

মাণিক বলিল, "কুসুম! বাগানে যাবে? তোমায় আম পেড়ে দিইগে চল।"

কাঁচা আমের নামে কুসুমের জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "চল না মাণিকদাদা!"

বাগানে প্রবেশ করিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া মাণিক বলিল, "আমি ভারি ফুল ভালবাসি।"

কুসুম বলিল, "খবদ্দার—খবদ্দার—ফুল তুলো না—ফুল তুললে দিদিমা যে বকে।"

মাণিক বলিল, "না তুলছিনে। শুধু ফুল ভালবাসি তাই বলছি। ফুলকে ভাল কথায় কি বলে জান?"

কুসুম মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, কে না জানে?—পুষ্প। আমাদের পদ্মপাঠে রয়েছে—

শাখীশাখে পুষ্পগুলি কিবা মনোহর।
পাখী ডাকে সুধা ঢালে শ্রবণ ভিতর॥

আচ্ছা মাণিকদাদা, তুমি ত ইংরেজী পড়, শাখী মানে কি বল দিকিনি?"—কুসুমের চক্ষু দুইটি মাণিকের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

মাণিক বলিল, "পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়?"

"আহা! তুমি আগে আমার কথার উত্তর দাও না মশাই। শাখী মানে কি?"

"শাখী মানে বৃক্ষ।"

"জানে রে!"—বলিয়া কুসুম হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল।

মাণিক বলিল, "এখন বল, পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়।"

"আর কি নাম? দাঁড়াও ভাবি।"—বলিয়া কুসুম ঠোঁট নাড়িয়া বিজ্‌বিজ্‌ করিয়া কি বকিতে লাগিল। বোধ হয় কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল।

মাণিক বলিল—"কু—"

কুসুম বলিল—"কু? কু কি?

কুহু কুহু রব করি ডাকিছে কোকিল।
কুসুম—

ওহো মনে পড়েছে। ফুলের আর একটা নাম কুসুম গো কুসুম।

কুসুম দুলায়ে ধীরে বহিছে অনিল॥

আচ্ছা, মাণিকদাদা, অনিল মানে যদি বলতে পার তবে ত বুঝি।"

মাণিক বলিল, "অনিল মানে বাতাস।"

বালিকার চক্ষে একটা আনন্দ ও প্রশংসার আলোক দেখা দিল।

মাণিক যথাশিক্ষা কুসুমের হাতখানি ধরিল। ধরিয়া বলিল, "বুঝতে পারলে না? আমি ফুল ভালবাসি বলেছি, তার মানে, আমি কুসুম ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি কুসুম। তুমি আমায় ভালবাস?"

কুসুম দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

মাণিক বলিল, "দেখ কুসুম, অনেকদিন থেকে একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি তুমি আমায় বিয়ে করবে?

প্রথম কথাটার মানে কুসুম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথাটার মানে বুঝিল। কিন্তু ঐ কথাতেই সব মাটি হইয়া গেল।—"ধেৎ"—বলিয়া মাণিকের হাত ছাড়াইয়া, কুসুম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহার পায়ের মল ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মাণিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কুসুম চক্ষুর অন্তরাল হইলে, মাণিক ব্যাপারটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। বিবাহের নামে কুসুম অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহার অর্থ কি? তবে কি কুসুম সম্মত নয়?

অধীত উপন্যাসগুলি মাণিক একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে মনে একটা মীমাংসাও পাইল। লজ্জা প্রণয়ের চির-সহচর। কুসুমের পলায়নের কারণ যে লজ্জা সে সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

॥ ৪ ॥

প্রভাস শুনিয়া বলিল—তবে আর কোনও চিন্তা নাই। ভালবাসে যখন স্বীকার করিয়াছে, তখন বিবাহে সম্মতি ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে। এখন উভয় পক্ষের পিতা-মাতার সম্মতি করাইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি।

মাণিক বলিল, "বাবাকে তুমি বললে বাবা রাজী হবেন ত?"

প্রভাস বলিল, "দেখ, তার চেয়ে বরং তুমিই বল, আমার বলাটা তত ভাল দেখায় না। হাজার হোক তোমার বাবা—আমার মামা বই ত নয়! বাবায় মামায় ঢের তফাৎ।"

মাণিক বলিল, "সে আমি পারব না। তুমি গোড়া থেকেই বললে তুমিই প্রস্তাবটা করবে, এখন পিছুচ্চ কেন?"

প্রভাস প্রথমটা মাণিককে যে পরিমাণ উৎসাহ দিয়াছিল, কার্য্যকালে তাহা রক্ষা

করিতে পারিল না। মাণিকের পিতা নন্দলালবাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা পাড়ায় বিলক্ষণ সাহসের প্রয়োজন।

এইরূপে ইতস্ততঃ করিতে করিতে সপ্তাহখানেক কাটিল। মাণিক ও প্রভাস যখনই নির্জ্জনে থাকিত—তখন আর দুজনের অন্য কথা নাই। পূর্ব্বে দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্য গোছের যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল, এখন তাহা ঘুচিয়া সখ্যে দাঁড়াইয়াছে।

একদিন মাণিক কুসুমের নামে একটা মস্ত কবিতা লিখিল। প্রভাস তাহা পড়িয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বলিল স্বয়ং অনুভব করিয়া কবিতা না লিখিলে কি আর কবিতা! বলিল, ইহা কুসুমকে নিশ্চয়ই দেখান উচিত।

উত্তম চিঠির কাগজে লালকালির বর্ডার টানিয়া, নীল কালি দিয়া মাণিক কবিতাটি নকল করিল। তাহার পর আবার অবসর খুঁজিয়া কুসুমের সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিল।

কুসুম কবিতা লইয়া পড়িল। কি বুঝিল সে জানে! মাণিক বলিল, কুসুম তুমি এটি রাখবে?"

কুসুম বলিল, "রাখব বইকি।"

মাণিক কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, "কারুকে দেখাবে না ত কুসুম?"

কুসুম প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কারুকে নয়।"

"খুব লুকিয়ে নিয়ে যেও। কোথায় রাখবে?"

"কেন আমার বাক্সে।"

মাণিক নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

ওদিকে পরম সত্যবাদিনী কুসুম বাড়ী গিয়াই বলিল, "দিদি একটা কথা বলি শোন্।"

তাহার দিদির নাম নলিনী। সে ষোল বৎসরের, বিবাহিতা; স্বামীর প্রেমে ভরপূর—মনের সুখে হাস্য কৌতুকময়ী।

দিদি আসিলে কুসুম বলিল, "মেজদি একটা মজা দেখবি?"

"কি?"

কুসুম খামখানি বাহির করিয়া বলিল, "কারুকে বলবিনে?"

"কার চিঠি লা?"—বলিয়া নলিনী ছোঁ মারিয়া খাম কাড়িয়া লইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।"

পড়িয়া নলিনী অবাক। পাতা উল্টাইয়া নাম খুঁজিল, কোনও নাম নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথা পেলি?"

"মাণিকদাদা দিয়েছে।"

"কে? ম্যানকা?"

"হ্যা।"

নলিনী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা কি হবে! তোকে এ সব লিখেছে কেন?"

কুসুম ভীত হইয়া বলিল, "তা কি জানি!"

"এ যে ভালবাসার কবিতা! তোদের ভালবাসা হয়েছে নাকি লো?"

কুসুম বলিল, "ম্যানকা আমায় একদিন বলছিল যে আমি তোকে ভালবাসি"

নলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, আহা তা বেশ! ছেলেটির পছন্দ ভাল"—বলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
দিবা রজনী
তব মুখখানি
মনে লই।"

পড়িয়া নলিনী হাসিয়া কুটিকুটি। বলিল—"তুনিয়ার আর মিল খুঁজে পেলে না, শেষে লিখলে কিনা 'মনে লই'। তার চেয়ে চিঁড়ে দই' লিখলে ঢের বেশী সরস হত! কি বলিস কুসমি? শোন্ দিকিন—

কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
দিবা রজনী
তব মুখখানি
চিঁড়ে দই।

অর্থাৎ কিনা চিঁড়ে দই দেখলে, কারু কারু যেমন খাবার লোভ হয়, তোমার মুখখানি

দেখলে— আমারও সেইরকম—লোভ হয়।”—বলিয়া নলিনী খুব হাসিতে লাগিল।

হাসির শব্দে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, ‘অত হাসছিস কেন? হয়েছে কি?’

নলিনী মার হাতে চিঠি দিয়া বলিল, “এই নাও মা, তোমার ছোট জামাই তোমার মেয়েকে কি লিখেছে দেখ।”

মা লেখার পানে চাহিয়া বলিলেন, ‘কথার ছিরি দেখ না! কি বলিস তার ঠিক নেই। কি এ?”

নলিনী মার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, “ভালবাসার চিঠি। এত বড় মেয়ে হ’ল, বিয়ে দিচ্চ না—তা মেয়ে নিজের বর নিজেই ঠিক ক’রে নিয়েছে।”

মা ত অবাক। বলিলেন, “কে লিখেছে এ সব?”

“সে পরে বলব। আগে শোনই না।”—বলিয়া মার হাত হইতে কবিতা লইয়া নলিনী পড়িতে আরম্ভ করিল—

“কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখখানি
দিবা রজনী
মনে লই।
শয়নে স্বপনে
কিম্বা জাগরণে
সদা সর্ব্বদা
চিন্তা করি তোমা
রূপ নিরুপমা
ওগো প্রেমদা।
ভাবিয়া ভাবিয়া
নিদ্রা তেয়াগিয়া
ফেলি অশ্রুজল।
যথা শুষ্ক তরু
হনু এবে সরু
দেহ টলমল।—”

মা বাধা দিলেন। বলিলেন, "কি পাগলামি করছিস, রঙ্গ ভাল লাগে না। কে লিখেছে বল্ না?"

"চৌধুরীদের ম্যান্কা লিখেছে।"

"ম্যান্কা? আরে গেল যা! কি দস্যি ছেলে গো! এ কি বিস্তে?"—বলিয়া মা কুসুমকে খুঁজিতে লাগিলেন, "কুস্মি, কুস্মি, কুস্মি, কোথা গেল?"

কুসুম গোলযোগ দেখিয়া পূর্বেই চম্পট দিয়াছিল।

ক্রুদ্ধা জননী বাহির হইয়া কুসুমকে গ্রেপ্তার করিলেন। বলিলেন, "এ কি রে শতেকখোয়ারী?"

কুসুম গোঁ হইয়া বলিল, "আমি কি জানি!"

"তুই জানিসনে ত কে জানে আবাগী?—খেয়ে খেয়ে দিনকের দিন হাতী হচ্চেন—আর এই সব বিস্তে হচ্চে! কি হয়েছে বল্।"

কুসুম বলিল, "হতভাগা নক্ষিছাড়া ম্যানকা আমায় দিলে ত আমি কি করব?—আমার বুঝি দোষ, বা রে!"

"কি বলেছে দেবার সময় তোকে?"

"বলেছে মাকে কি কাউকে দেখাসনে—বাক্সতে লুকিয়ে রাখিস।"

মা তখন কুসুমকে অনেক জেরা করিলেন। জেরার শেষে কুসুম বলিল, "একদিন বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যান্কা আমায় বললে কি, তোকে আমি আম পেড়ে দেবো তুই আমায় বিয়ে করবি? 'দূর পোড়ারমুখো' বলে আমি পালিয়ে এলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রাগের মধ্যেও মার ওষ্ঠের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। শেষে তিনি বলিলেন—"শোন্ বলছি। ফের যদি ম্যান্কার ত্রি-সীমানায় যাবি কি ওর সঙ্গে কথা ক'বি, কি খেলা করবি—তা হলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব। বুঝেছিস?"

কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বা রে! আমি কি করব? আমায় দিলে কেন?"

মা তখন সে কবিতা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া উনানে ফেলিয়া দিলেন।

॥ ৫ ॥

অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন—যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনও মসৃণ হয় নাই। যে ভালবাসিয়াছে, সেই কাঁদিয়াছে। প্রেম যে 'কেবলি যাতনাময়', তাহাতে যে 'কেবলি চোখের জল' এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

কুসুম ত বকুনি খাইয়াই নিস্তার পাইল, কিন্তু মাণিকলালের অদৃষ্টে আরও দুর্গতি

লেখা ছিল।

মাণিকের পিতা নন্দ চৌধুরী গ্রামের ডাক্তার—খুব পশার। প্রাতে রোগী দেখিতে বাহির হন, যখন বাড়ী আসেন তখন প্রায় বারোটা। স্নান আহার করিয়া নিদ্রা যান।

সুতরাং প্রভাস ও মাণিক পরামর্শ করিল, বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভাস গিয়া কথাটা পাড়িবে।

দুইজনে বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। একটা প্রবল আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় দুইজনের মুখই কালিমাময়।

শেষে চারিটা বাজিল শব্দ শোনা গেল, বিছানা হইতে নন্দ চৌধুরী হাঁকিলেন, "ওরে বুনো—তামাক নিয়ে আয়।"

আরও কয়েক মিনিট গেল। তারপর কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাস গিয়া মামাবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

নন্দ চৌধুরী বিছানার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চৌকিতে গুড়গুড়ি রক্ষিত। ধূমপান করিতেছেন।

প্রভাস প্রবেশ করিয়া, বিছানার কাছে একটা চেয়ার ছিল তাহাতে বসিল।

নন্দ চৌধুরী বলিলেন, "কি প্রভাস!" তাঁহার স্বর বৈকালিক নিদ্রায় শ্লেষ্মা-জড়িত।

প্রভাত কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল, "আজ্ঞে একটা কথা আজ আপনাকে বলব মনে করেছি।"

নন্দ চৌধুরী উৎসুক হইয়া, গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে খুলিয়া প্রভাসের পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি?"

প্রভাসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল—কেন আসিলাম—কেন এ জালে নিজেকে জড়াইলাম?—কিন্তু আরম্ভ যখন করিয়াছে, আসরে নামিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। সুতরাং বাক্যস্ফুরণ করিতে বাধ্য হইল। বলিল, "আমাদের মাণিকের জন্যে ভারি চিন্তিত হতে হয়েছে।"

"কেন? কি হয়েছে? কোনও ব্যারাম-স্যারাম নাকি?" ডাক্তার মানুষ, ব্যাধির কথাটাই প্রথমে মনে হয়।

প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক বটে।"

চৌধুরী গুড়গুড়ির নল পুনরায় মুখে লইয়া বলিলেন—"কি রকম?"

"ও একটি মেয়ের সঙ্গে Love-এ পড়েছে।"

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে একেবারে বিছানায় ফেলিয়া নন্দ চৌধুরী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বললে?"

প্রভাস তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া বিপদ গণিল। বলিল, "আজ্ঞে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে?

"প্রণয় হয়েছে? সে আবার কি রকম? ব্যাপারখানা কি? কার সঙ্গে প্রণয় হয়েছে?"

"আজ্ঞে, অতুল বাঁড়ুয্যের যে কুসুমলতা ব'লে একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গেও 'লভে' পড়েছে। তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি ওর জীবনের সুখ চান, তবে কুসুমের সঙ্গে ওর বিবাহ দিন।"

নন্দ চৌধুরী শুনিয়া গম্ভীর হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কি রকম ক'রে 'লবে' পড়ল?"

প্রভাস মনে মনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। ভাবিল, তবে সন্তানের দুঃখে পিতার মন গলিয়াছে। বলিল, "আজ্ঞে, কি রকম করে পড়ল তা বলা বড় কঠিন—তবে এ পর্য্যন্ত বলতে পারি যে আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল।"

চৌধুরী বলিলেন, "উভয়তঃ প্রবল?—বটে!"—বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করতে চায়?"

মাথা নীচু করিয়া, ধীরে ধীরে প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে এইত একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, তা হলে ওর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।"

চৌধুরী বলিলেন, "মরুভূমি? ওঃ!"—বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

প্রভাস একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয় প্রায়ই ভারি গভীর হয়। তাকে বাধা দিতে যাওয়া অনেক সময় সর্ব্বনাশ।"

চৌধুরী বলিলেন, "ম্যান্‌কাকে ডাক।"

প্রভাস উঠিয়া পড়িবার ঘরে গেল। দেখিল, হাতে মুখ ঢাকা দিয়া মাণিক শুইয়া আছে। একটু হাসিমুখে বলিল, "মাণিক যাও ভাই, মামাবাবু ডাকছেন।

মাণিক বলিল, "কি রকম বুঝলে?"

"এ পর্য্যন্ত ত খুবই আশাপ্রদ। খুব সুহৃদয় ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।"

মাণিকের কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সত্যই কি এত সৌভাগ্য তাহার হইবে? বলিল, "চল তবে।"

প্রভাস বলিল, "তুমি একা যাও। কারণ এ সময় কোনও তৃতীয় ব্যক্তির থাকাটা ঠিক নয়। বিষয়টা ভারি—কি বলে গিয়ে—ইয়ে কিনা।"

মাণিক বলিল, "না ভাই তুমি এস—নইলে আমার ভারি ভয় করবে।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, মিনিট দশ পরে আমি যাচ্চি"—বলিয়া মাণিককে ঠেলিয়া দিল।

মাণিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা আর্সির কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁপ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাণিকের ছায়া আর্সিতে পড়িল।

নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এগ্‌জামিন কবে?"

মাণিক বলিল, "আর বারো দিন আছে।"

"কি রকম তৈরি হল?"

"আজ্ঞে, হয়েছে এক রকম।"

"পড়াশুনো করছিস বেশ মন দিয়ে? না খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস?"

"আজ্ঞে না, খেলা বেশী করিনে।"

"তবে কি করিস? 'লবে' পড়েছিস নাকি শুনলাম?"

মাণিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া, বাম হস্ত দ্বারা মাণিকের দক্ষিণ কর্ণটি ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, "উত্তর দিচ্ছিসনে যে?"

মাণিক কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কথা বাহির হইল না।

তাহার পিতার রক্ত-চক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল।

ঘূর্ণায়মান চক্ষু স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ইষ্টুপিড্ শূয়োর! আজ বাদে কাল এগজামিন—লেখা গেল পড়া গেল, লব্ হচ্চে?"—বলিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহার গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় কষাইয়া দিলেন।

প্রভাস এই সময়ে দুয়ারের কাছ বরাবর আসিয়াছিল। চড়ের শব্দ শুনিয়া সে অবিলম্বে চম্পট দিল।

মাণিক দুই হাতে মুখ ও চক্ষু ঢাকিয়া অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নন্দ চৌধুরী তখন বালককে ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, "এ ক'দিন দিবেরাত্তির কেবল প্রভাসের সঙ্গে গুজগুজ ফুস্‌ফুস্ হচ্চেই হচ্চেই—আমি ভাবি ব্যাপারটা কি—এরা কুইনের রাজ্য নেবারই মৎলব করছে—না কি

করছে ? হতভাগা পাজি নচ্ছার হনুমান! লবে পড়া হয়েছে! মরুভূমি হয়ে যাবে! এত কথা শিখলে কোথা তাই ভাবি। আমরা বুড়ো হয়ে মরতে চললাম, এত কথা ত জানিনে! পড়াশুনোর নাম নেই। খাবি কি এর পরে? আমি এই সারা দুপুর রোদ্দুরটা মাথায় ক'রে, রুগীর নাড়ী টিপে বেড়াচ্ছি, দুটো পয়সার জন্য মুখে রক্ত উঠে মরছি—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন মন দিয়ে পড়ে শুনে নিজের কায কিনে নে—তা নয় লবে পড়েছেন ছেলে আমার! আর প্রভাসটা যে কলেজে লেখাপড়া শিখে এত বড় বাঁদর হয়েছে তা ত জানতাম না! ওকালৎনামা নিয়ে এসেছে! আরে গেল যা!—ফের যদি ওসব পাগলামি শুনতে পাই ত জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে দেবো।"

অতঃপর মাণিক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল,। মাণিক ছেলেটিকেও অতি সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খাইল যে তাহার পরদিন অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগের সপ্তাহখানেক স্কুলে গেল না। প্রভাস চলিয়া গিয়াছিল। প্রেমিকের আদর্শ খর্ব্ব তার জন্য মাণিকের কাহারও নিকট জবাবদিহি করিবারও রহিল না। তাই অসুখ দুই দিনই ভাল হইলে—বাকী দিনগুলির অধিকাংশ সময় মাণিক বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া অতিবাহিত করিল।

[। ভাদ্র, ১৩০৮]

অযোধ্যার উপহার

॥ ১ ॥

অখিলবাবু কাছারি হইতে বাড়ী আসিবামাত্র গৃহিণী তাঁহাকে ভৃত্য অযোধ্যার সকল গুণের কথা বলিয়া দিলেন।

অখিলবাবু সেদিন একটা মোকর্দ্দমা হারিয়া আসিয়াছিলেন। বিপক্ষ উকীল তাঁহাকে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিঁধিয়া দিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার মেজাজটা অত্যন্ত বিগড়াইয়া ছিল। তাহার উপর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন এই ব্যাপার!

গৃহিণী চক্ষুযুগল জবাবর্ণ ও পক্ষরাজি জলসিক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। অখিলবাবু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। অদূরে একজন ঝি যাইতেছিল, অযোধ্যাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এক মিনিট পরে, অযোধ্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার চক্ষু অন্যদিনের মত আনত নহে। গোঁফযোড়াটা সে উত্তমরূপে পাকাইয়া জর্ম্মণ সম্রাটের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া দিয়াছে। তাহার মস্তকে পাগড়ী। বাড়ীর সচরাচর অযোধ্যা পাগড়ী পরে না—কিন্তু কোনও কারণে তাহার মেজাজটা যখন অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠে, তখনি সে তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া লয়। মনে বীরত্বের ভাব জাগিয়া উঠিলে বাহিরে তাহার চিহ্ন-প্রকাশের ইচ্ছা স্বাভাবিক।

অযোধ্যার আকার প্রকার দেখিয়া অখিলবাবু ক্রোধবহ্নি আরও প্রখরতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি আত্মস্থ হইয়া শান্তভাবে অথচ কঠোরস্বরে জজের রায় পড়ার মত ধীরে ধীরে বলিলেন—

"অযোধ্যা, তুই অনেক কালের চাকর। কিন্তু পুরোনো হয়ে কোথায় ভাল হবি, না যতই বুড়ো হচ্ছিস, ততই তোর বজ্জাতি বাড়ছে। মনিব বলে যে একটা পদার্থ কি ভয় ডর তা তোর নেই। হাড় জ্বালাতন করে তুলেছিস। তুই পুরোনো চাকর ব'লে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর না। তুই যা। এই পহেলা তারিখ থেকে তোকে জবাব দিলাম।"

অযোধ্যা মাথা নাড়িয়া, উদ্ধতভাবে অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল, "যো হুকুম মহারাজ, হম্ রাজিকা সাথ চলা যায়েঙ্গে। আপ জবাব নেহি দেতে' তো খুদ্ হম আজ ইস্তফা দেনেকো তৈয়ার হুয়া থা।" অযোধ্যার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল।

কেহ না মনে করেন যে অযোধ্যা বাঙ্গালা কহিতে জানে না। সে এ বাড়ীতে আঠারো বৎসর চাকরি করিয়াছে—প্রায় বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গালা কহিতে পারে। কিন্তু রাগিলে সে আর বাঙ্গালা কহিত না। বাঙ্গালাভাষাটা ভালমানুষীর ভাষা; তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণু জাতির ভাষা। অযোধ্যা কেন—অনেক বাঙ্গালীও প্রবল ক্রোধের সময় বাঙ্গালা কহিতে পারেন না—হিন্দী বা ইংরাজী কহিয়া থাকেন।

অযোধ্যার এ দুর্ব্বিনীত উক্তিতেও অখিলবাবু আত্মহারা হইলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীরভাবে বলিলেন, "বেশ। কিন্তু খবরদার আর যেন এসে জুটিসনে। বার বার তিনবার কসুর মাফ করেছি—আর করব না। এবার এলে আর কিছুতেই রাখব না। এই শেষ।"

অযোধ্যা বলিল, "নেহি গরীব পরবর আরও নেহি আওয়েঙ্গে। হমৃভি দিক্দারী হো গিয়া—"

তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া, দুয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, ঘূর্ণিতচক্ষে বাবু বলিলেন, "যাও।"

অযোধ্যা যাইতে যাইতে তাহার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করিয়া লইল, "থক্ গিয়া। নোক্রী আওর নেহি করেঙ্গে যো কিয়া সো কিয়া—বস্ অব্ হম্ হো চুকা।"

অখিলবাবু চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া ঝিকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে আজ্ঞা করিলেন। অন্যদিন অযোধ্যাই তাঁহার তামাক সাজিত।

॥ ২ ॥

বেলা দ্বিপ্রহর, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অখিলবাবু কাছারি গিয়াছেন, ছেলেরা কলেজে, গৃহিণী পালঙ্কে নিদ্রামগ্না।

আজ শীতটা কিছু বেশী। অযোধ্যার বারন্দায় রৌদ্রে বিছানা টানিয়া একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই আসিতেছে না। খুকী তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাকাচুল তুলিয়া দিতেছে।

খুকী বলিল, "অযুধ্যা তুই কেন যাবি ভাই ?"

অযোধ্যা বলিল, "তোর বাবা যে হামায় ছোড়ায় দিয়েছে ভাই।"

কাল পয়লা তারিখ, অযোধ্যা কাল যাইবে। খুকী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসবি অযুধ্যা ?"

অযোধ্যা বলিল, "আর কেন আসব দিদি ? এবার যাব আর আসব না।"

খুকী অযোধ্যার গলা জড়াই ধরিয়া বলিল, "না অযুধ্যা তোকে আসতে হবে।"

অযোধ্যা বলিল, "আচ্ছা ভাই, তোর যখন সাদি হবে, তখন তুই হমায় খৎ লিখিস হামি আসব।"

খুকী দুঃখিত স্বরে বলিল, "আমি কি লিখিতে জানি ?"

"দাদাবাবুকে বলবি—দাদাবাবু লিখে দেবে তোর খৎ।"

অযোধ্যা কিয়ৎক্ষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বলিল, তুই হামার সাদিতে যাবিনে ভাই ?"

খুকী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, দূর "পোড়ারমুখো—তোকে আবার সাদি করবে কে ? তুই যে বুড়ো হয়ে গেছিস !"

অযোধ্যা বলিল "দূর পোড়ারমুখী, হামি বুঢা হব কেন ?

অযোধ্যার মাথায় চুল পাকাইতে পাকড়াইতে খুকী বলিল, "না তুই বুড়ো নস্। আমি

যেন আর কিছু জানিনে ! সেদিন দিদি, মা, সবাই বলছিল ।"

"কি বলছিল ?"

"বলছিল অযুধা ড্যাকরার বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে, বলে কিনা বিয়ে করব। ওকে কেউ বিয়ে করলে ত ও বিয়ে করবে ।"

অযোধ্যা বলিল, "আরে দেখিস দেখিস, যখন সাদি হবে তখন সবাই কি বলে দেখিস ।"

খুকী বলিল, "অযুধা তুই কেন সাদি করবি ভাই ?"

"নইলে হামায় কে ভাত রেঁধে দেবে দিদি ?"

এই উত্তরে অযোধ্যার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস লুক্কায়িত ছিল। সে তিনবার কর্ম্ম-চ্যুত হইয়া দেশে গিয়াছিল, পুনরায় যখনি হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল—আসিয়া বলিয়াছিল,'হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয় মা, তাই চলে এলাম।' বাল্যকালে অযোধ্যার একবার বিবাহ হইয়াছিল। অযোধ্যা যখন অখিলবাবুর কর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত হয়—তখন তাহার স্ত্রী জীবিত ছিল। এখন সে বহু বৎসর ধরিয়া বিপত্নীক।

খুকী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি এবার বিয়ে করবি অযুধা ?"

"সত্যি না ত কি ঝুট্ বলছি ?"

"ক' হাজার টাকা পাবি ?"

অযোধ্যা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "টাকা মিলবে কি আউর দেনে পড়ি রাক্ষুসি ! এ কি বাঙ্গালার সাদি ?"

"গহনাও দিতে হবে ?"

"গহনাভি দেনে পড়ি না ত কি। বহুৎ রুপিয়া খরচ রে দিদি—বহুত রুপিয়া খরচ।" বলিয়া অযোধ্যা পুনরায় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খুকী কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তাহার পর আগ্রহের স্বরে বলিল, "অযুধা তোর বউকে আমি একটা গহনা দেবো।"

অযোধ্যা হাই তুলিয়া বলিল, "কি গহনা দিবি ভাই ?"

খুকী বলিল, "কেন ? আমার পুরানো বালা রয়েছে সাড়ে তিন ভরির, সে ত আর আমার হাতে হয় না, সেই বালা তোর বউয়ের জন্যে দেবো এখন নিয়ে যাস।"

অযোধ্যা হাসিল। বলি, "আগে কনিয়া ঠিক হোক—তখন বালা দিস, তাবিজ দিস, মল দিস—সব দিস !"

খুকী বলিল, "না তুই বালাযোড়াটি আমার নিয়ে যা।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি খুকী উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালা তুইটি আনিয়া বলিল, "রেখে দে এই বেলা।

মা উঠলে জানতে পারলে হয়ত দিতে দেবে না।”

অযোধ্যা বলিল, “বালা কোথা থেকে নিয়ে এলি রাক্‌ষুসি ?”

“কেন, বালা কোথায় থাকে আমি জানিনে বুঝি ?”

“যা যা বালা যেখানে ছিল রেখে আয়।”—বলিয়া অযোধ্যা হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল।

খুকী বালা দুইটি বাজাইয়া গুন গুন স্বরে গান করিতে লাগিল। অযোধ্যা বলিল, “যা রেখে আয় বলছি, হারিয়ে ফেলবি ত মুস্কিল হবে।”

খুকী কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। অযোধ্যা শেষবার একবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিল।

॥ ৩ ॥

খুকী তাহার মার ঘরে গিয়া দেখিল, মা তখনও নিদ্রিত। পালঙ্কের উপর হইতে তাঁহার রাশিকৃত চুল মেঝেতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

খুকী তাহার পর পূজার ঘরে গিয়া, কোশা হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া চরণামৃত পান করিল। পান করিয়া, ঘাড়টি বাঁকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিল—“আঃ।” ঘরের কোণে বিড়ালটা বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। খুকী পূজার ফুল এক মুঠা লইয়া আস্তে আস্তে বিড়ালটার কাছে গিয়া 'নমো নমো' বলিয়া তাহার মাথায় একটি একটি করিয়া ফুল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিড়াল মস্তকে শীতলস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। কাতরতাসূচক একটি 'মেও' শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পূজা ভঙ্গ হইল দেখিয়া ভক্ত খুকী বিড়ালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ৎক্ষণ ধাবিত হইল। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, কবাটে শিকল দেওয়া রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা টুল বুকে করিয়া আনিয়া, দুয়ারের কাছে রাখিল। টুলের উপর উঠিয়া শিকল টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই খুলিতে পারিল না। তখন নামিয়া ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক টুকরা কয়লা কুড়াইয়া পাইবামাত্র, তাহার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখা দিল। কয়লাটি লইয়া খুকী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। স্নানের স্থানে অনেকক্ষণ জল পড়ে নাই—বেশ শুকাইয়া ছিল। সেই শুষ্ক স্থানে কয়লাটি দিয়া খুকী কয়েকটা ঘর আঁকিল এবং প্রত্যেক ঘরে একটা করিয়া 'ক' লিখিয়া দিল। তাহার পর টব হইতে ঘটি করিয়া জল লইয়া, ধীরে ধীরে স্বরচিত চিত্রের উপর ঢালিতে লাগিল। অন্ততঃ বিশ ঘটি জল ঢালিবার পর নিরস্ত হইল। একটু শীতও করিতে লাগিল। তখন খুকী বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। গিয়া দেখিল অযোধ্যা দিব্য নাসিকাধ্বনি করিতেছে।

খুকী আস্তে আস্তে অযোধ্যার বিছানায় বসিল। তাহার কোমরে একটি চাবি বাঁধা ছিল, সাবধানে সেটি খুলিয়া লইল। অযোধ্যার দেবদারু কাঠের বাক্সটি কোথায় থাকিত, তাহা খুকী জানিত। বাক্সট খুলিয়া বালা দুইটি আস্তে আস্তে সব জিনিসের নীচে লুকাইয়া রাখিল। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে সে বাক্সে টিনে বাঁধানো—পৃষ্ঠদেশে গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত একখানি আর্সি ও একটি কাঠের চিরুণী ছিল। খুকী নিজের চুলটা একটু আঁচড়াইয়া লইল। শেষে বাক্স বন্ধ করিয়া আবার পূর্ব্বমত অযোধ্যার কোমরে বাঁধিয়া রাখিল।

॥ ৪ ॥

পরদিন প্রভাতে সকাল সকাল আহার করিয়া, গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, বাবুকে প্রণাম করিয়া, দাদাবাবু ও খুকীর নিকট সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিল। খুকী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—গৃহিণীও বারম্বার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুজল মুছিলেন।

অযোধ্যার গ্রাম মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে দশ ক্রোশ পথ। মুঙ্গের হইতে একখানি গোরুর গাড়ী করিয়া অযোধ্যা বাড়ী গেল।

এই মুঙ্গেরে সে প্রথম অখিলবাবুর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। সে কি আজিকার কথা অখিলবাবু তখন নূতন আইন পাস করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরে তাঁহার উত্তমরূপ পশার জন্মিলে তিনি হাইকোর্টে আসিলেন। যাত্রার দিন এই মুঙ্গেরে ষ্টেশনে গাড়ী চড়িবার গোলমালে অখিলবাবুর পুত্র সতীশ হারাইয়া যায়। কেল্লার ফটকের নিকট অশ্বথ গাছের নিম্নে দাঁড়াইয়া সতীশ কাঁদিতেছিল, অযোধ্যাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। বাবু খুসি হইয়া তাহাকে নিজের নূতন বিলাতী জুতোযোড়াটা বখশিস দিয়াছিলেন। সে সকল কথা মনে পড়িল। তাহার পর সেই সতীশ কলিকাতার জরবিকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমানে রাত্রি জাগিয়া একুশ দিন অযোধ্যা সতীশের শুশ্রূষা করিয়াছিল। শবদাহ করিয়া আসিয়া অখিলবাবু অযোধ্যার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—'অযুধা—একবার তুই আমার হারা ছেলে খুঁজে দিয়েছিলি—এবার খুঁজে নিয়ে আয়।'—সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে অষ্টাদশ বৎসর যাহাদের সহিত কাটিয়াছে, তাহাদের সহিত বন্ধন এবার চিরদিনের তরে ছিন্ন হইল। অযোধ্যার গাড়ী অনেক দূর অবধি গঙ্গার ধার দিয়া গেল। পথ যখন বাঁকিল, গঙ্গা দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইলেন—তখন অযোধ্যা যোড়হস্তে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনের একটা কামনা নিবেদন করিল।

বাড়ী হইতে অনেক মাস অযোধ্যা কোনও পত্রাদি পায় নাই। বাড়ীতে তার

এক বৃদ্ধ চাচী ছিল, আর কেহ ছিল না। এতদিন সে চাচী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াই গিয়াছে, মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, দরজায় তালা বন্ধ। প্রতিবেশীগৃহে সন্ধান করিতে গেল। শুনিল তাহার চাচী ছয়মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। পাড়ার বিজ্ঞলোকেরা পরামর্শ করিয়া, 'অযোধ্যা মাহাতো, মোকাম কলকত্তা' এই ঠিকানা দিয়া দামড়িলালের দ্বারা তাহাকে (বেয়ারিং) পত্রও লেখাইয়াছিল—কিন্তু সে পত্র মাস দুই পরে ফিরিয়া আসে এবং বেচারা দামড়িলালের এক আনা পয়সা জরিমানা দিতে হয়। অযোধ্যাকে তাহারা পরামর্শ দিল, দামড়িলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অযোধ্যা যেন তাহার এক আনা পয়সার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।

চাবী লইয়া অযোধ্যা বাড়ী আসিল। দরজা খুলিয়া দেখিল, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট বড় নানাজাতীয় আগাছা জন্মিয়াছে। ঘর খুলিল—বহুকাল বন্ধ থাকায় ঘরের মেঝে অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে হইয়া গিয়াছে। খাটিয়ার একটা পায়ার আধখানা উইপোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। গোটাকতক ইন্দুর ও আরসুলা হঠাৎ আলো দেখিয়া খড়খড় শব্দে পলাইয়া গেল।

অযোধ্যা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, চাবি আবার বন্ধ করিয়া, একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় লইল। কর্ম গিয়াছে, এ কথা তাহাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারিল না;—বলিল ছুটি লইয়া আসিয়াছি।

তাহারা অযোধ্যাকে অভ্যর্থনা করিয়া তামাক দিল। সে তামাক দুই টান টানিয়াই, থকথক্ করিয়া, অযোধ্যা হুঁকা নামাইয়া রাখিল। বাবুর বাড়ী অম্বুরী তামাক খাইয়া খাইয়া তাহার পরকাল গিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অযোধ্যা মজুর নিযুক্ত করিয়া বাড়ী ঘর দুয়ার পরিষ্কার করাইল। লোকে বলিল অযোধ্যা চাকরি করিয়া আমীর হইয়া আসিয়াছে, নহিলে, যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেরা মজুরী করিয়া দেহপাত করিয়াছিল, সে কখনও দিনে দুই আনা হিসাবে মজুর নিযুক্ত করে!

নিজের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া অযোধ্যা অন্নপাক করিল। আহারান্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া, রেড়ীর তেলে প্রদীপ জ্বালাইল। সে ম্লান আলোক দেখিয়া, কেবলই তাহার প্রভু গৃহের বিদ্যুৎ-আলোক মনে পড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন গেল—মাস কাটিল। পাড়ার লোকে ক্রমাগত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কতদিনের ছুটি, আবার কবে কলিকাতা যাইতে হইবে? সে বলে, এই যাইব

এবার দিনকতক পরে। অযোধ্যা একাকী থাকে—কাহারও সঙ্গে মেশে না। তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রতিবেশীগণকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সহিত হাস্তামোদ করিতে অযোধ্যার প্রবৃত্তিই হয় না। সে নিজের ঘরে নীরবে বসিয়া থাকে—আর কেবল ভাবে। অখিলবাবুর ছেলেমেয়েগুলিকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছিল—তাহার মনটি অষ্ট প্রহর কলিকাতার সেই প্রিয় গৃহখানিতে পড়িয়া থাকে।

এইরূপে দুই মাস কাটিলে অযোধ্যা স্থির করিল—দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখিয়া সকলের সংবাদ আনাইতে হইবে। ইংরাজিতে চিঠি লেখাইতে হইবে। গ্রামে কেহ ইংরাজি জানিত না। এ অঞ্চলে ইংরাজি জানিত কেবল খড়কপুরের পোষ্টমাষ্টার। গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ উত্তম গব্যঘৃত সংগ্রহ করিয়া, দুই ক্রোশ দূরে খড়কপুরে গিয়া, পোষ্টমাষ্টারকে উহা উপঢৌকন দিয়া, অযোধ্যা কলিকাতায় চিঠি লেখাইয়া আসিল।

সপ্তাহ পরে দাদাবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। যে পেয়াদা এ চিঠি আনিয়া অযোধ্যাকে দিল, অযোধ্যা তাহাকে মাচা হইতে একটা বিলাতী কুমড়া পাড়িয়া বখশিস্ করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ পাগড়ী বাঁধিয়া খড়কপুরে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের দ্বারা চিঠি পড়াইল।

দাদাবাবু তাহার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। বাড়ীর সকলে খুসী হইয়াছেন। এই বৈশাখ খুকীর বিবাহ। অযোধ্যার জন্য খুকীর ভারি মন কেমন করে।

চক্ষের জল মুছিয়া অযোধ্যা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাবিল, দশটা টাকা মনি-অর্ডার করিয়া সে দাদাবাবুকে পাঠাইবে—দাদাবাবু যেন অযোধ্যার হইয়া খুকীর বিবাহে তাহাকে একখানি রঙীন-শাড়ী কিনিয়া দেন।

টাকা বাহির করিবার জন্য অযোধ্যা বাক্স খুলিল। এ বাক্স সে বাড়ী আসিয়া অবধি একদিনও খুলে নাই। বাক্স খুলিয়া দেখিল, সোণার বালা!

দেখিয়া প্রথমটা সে অবাক হইয়া গেল। চিরুণীখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, তাহাতে খুকীর দুইগাছি লম্বা চুল লাগিয়া রহিয়াছে। তখন সমস্ত বুঝিতে পারিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাহার পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইল না পরদিন সে ঘরে-দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

বড়বাজারে তাহার এক পরিচিত মহাজন ছিল। তাহার আড়তে গিয়া অযোধ্যা কয়েক দিবস রহিল। কিছু সোণা কিনিয়া, খুকীর বালাযোড়াটা ভাঙিয়া ভাল করিয়া গড়াইয়া লইল।

নিজের জন্যও বস্ত্রাদি খরিদ করিল। একখানি ধুতি হরিদ্রায় রঞ্জিত করিল। গোলাপী রঙের একটি পাগড়ী তৈয়ারী করিল। উৎসব-বেশ পরিধান করিয়া, পাতলা নীল কাগজে মুড়িয়া বালা দু'গাছি লইয়া, অযোধ্যা ৫ই বৈশাখ অপরাহ্ন সময়ে অখিলবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল।

বাটীর সকলেই তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। খুকী বালা পরিয়া আমোদে আটখানা। অখিলবাবু আসিয়া বলিলেন, "অযুধা তুই আমার চিঠি পেয়েছিস!"

অযোধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "দাদাবাবুর চিঠি?"

"দাদাবাবুর কেন? আমার চিঠি। খুকীর বিয়েতে আমি তোকে এক সপ্তাহ হল নেমন্তন্ন করে রেজেষ্টারি চিঠি লিখেছি—গাড়ীভাড়ার জন্যে দশ টাকার নোট পাঠিয়ে দিয়েছি—তুই পাসনি?"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কি দেশে ছিল নাকি? ও এই কলকাতায় ছিল, খুকীর জন্যে বালা গড়াচ্ছিল।"

বালার কথা শুনিয়া বাবু রাগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুই গরীব মানুষ খেতে পাসনে, অত টাকা খরচ করতে গেলি কেন? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তোর?"

অযোধ্যা তখন হাসিয়া হাসিয়া বালার ইতিহাস বলিল।

গৃহিণী বলিলেন, "বটে! তাই বলি খুকীর পুরাণো বালাযোড়াটা গেল কোথা? আলমারিতেই রেখেছিলাম, না সিন্দুকেই ছিল ঠিক করতে পারিনে।"

অখিলবাবু বলিলেন, "তা বেশ। খুকীরই জিৎ।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

অযোধ্যা নিজের রঙীন পাগড়িটি খুলিয়া সন্তর্পণে উঠাইয়া রাখিয়া বিবাহ বাড়ীর কার্য্যে মাতিয়া গেল।

[বৈশাখ ১৩১০]

আধুনিক সন্ন্যাসী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঁকীপুরে কলেজে পড়িতাম, হিন্দুয়ানির দিকে ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মস্তকে প্রকাণ্ড একটি শিখা ছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতাম।

মাছটা খাইতাম, কিন্তু মাংস খাইতাম না। আমাদের মেসের বাসায় সপ্তাহে একদিন করিয়া মাংস হইত। সেদিন ম্যানেজার আমার জন্য পায়সের বন্দোবস্ত করিতেন।

বাঁকীপুরে একটি "মহাদেব-স্থান" আছে,—সেখানে প্রায়ই গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম,—যদি কোন সাধুমহাত্মার দর্শন পাই। "সাধু'র দর্শন মোটেই দুর্লভ ছিল না, কিন্তু সাধুমহাত্মার দর্শন কখনও ঘটে নাই। অধিকাংশ সাধুই নিরক্ষর,—শাস্ত্রজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেই হয়,—কেবল কতিপয় বাঁধা বুলি মুখস্থ আছে; আর গঞ্জিকা ভস্ম করিতে নিতান্তই সুনিপুণ। তবু তাহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, ধর্ম তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম। তুলসীদাস বলিয়াছেন—

সব সে বসিহো, সব সে রসিহো
সব সে মিলিহো ধায়
ক্যা জানে ক্যা ভেখ মে
নারায়ণ মিল যায়।

আমি তখন বি-এ ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষার আর পাঁচদিন মাত্র বিলম্ব আছে। একজন আসিয়া সংবাদ দিল, গঙ্গাতীরে একজন যথার্থ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পুস্তকাদি বন্ধ করিয়া বাহির হইলাম। একাকী গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

তখন বেলা তিনটা। গঙ্গাতীরে, স্নানের ঘাটগুলি হইতে দূরে, একখানি খড়ে বাঁধা ক্ষুদ্র কুটীর আছে। সেইখানে সাধুবাবা আশ্রম স্থাপনা করিয়াছেন। আমি নগ্নপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিন চারিজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি সাধুবাবার কাছে বসিয়া আছে। সাধুবাবা হিন্দিতে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

আমি একটি শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া গিয়াছিলাম। সেই মিষ্টান্ন এবং একটি সিকি সাধুবাবার পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, অন্যান্য ভক্তগণেরও উপহার সেখানে রক্ষিত রহিয়াছে।

সাধুবাবা হিন্দুস্থানী কয়েকটির সঙ্গে তুলসীদাসের রামায়ণ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি বাঙ্গালী,—আমাদের বাঙ্গালা রামায়ণ আছে; কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার গ্রন্থে ভক্তিরসের যেরূপ ফোয়ারা তুলিয়াছেন,—সেরূপ আমাদের রামায়ণে নাই।"—বলিয়া তিনি তুলসীদাস হইতে নানাস্থান আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এ ব্যাপারে আমার মনে যেন একটু খট্‌কা লাগিল। কথাটা যেন একটু খোসা-

মোদের মত শুনাইতেছে না?—খরিদ্দার খুসী করার মত? কায হাঁসিল করার মত? আমাদের গ্রামে একটি বিধবা ছিলেন,—পত্র লেখাইবার প্রয়োজন হইলে আমার কাছে আসিয়া বলিতেন—"আহা, রাজুর হাতের লেকাগুলি যেন মুক্তোর মত। একখানি চিটি লিকে দেবে বাপধন?"

হিন্দুস্থানীরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন সাধুবাবা প্রণামীর পয়সাগুলি জড় করিয়া গণিয়া দেখিলেন। সিকি, দুয়ানী ও পয়সা অনেকগুলি হইয়াছিল। গণিয়া বাবাজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি তখন মনে ভাবিতেছি, 'ইনিও একটি ভণ্ড সাধু। আমার সময় ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে।—কিন্তু পরক্ষণেই সাধুবাবা যে কথা বলিলেন, তাহাতে আমার পূর্বভাব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল, এবং মন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাধুবাবা বলিলেন, "আজ প্রণামীতে প্রায় একটাকা পাইয়াছি। এই টাকাটি দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে যাইবে। ইহাতে ষোলজন লোকের একবেলার আহার সম্পন্ন হইবে।"

আমি অনেক সাধুর সঙ্গে বেড়াইয়াছি,—কোনও সাধুর মুখে ত কখন দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার বা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির প্রতি মমতার কথা শুনি নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি প্রণামীতে যাহা পান সমস্তই কি ঐ প্রকারে সদ্ব্যবহার করেন?"

"সমস্ত। একটি কর্পদ্দকও আমি রাখি না।"

"তবে আপনার চলে কি করিয়া?"

তিনি আমার প্রদত্ত ও অন্য কয়েকটি মিষ্টান্নের ঠোঙ্গা দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ। আমার কি ক্ষুধায় মরিবার উপায় আছে?"

আমি বলিলাম, "আপনি সন্ন্যাসী মানুষ,—নানাস্থানে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান,—এমন ত অনেকদিন হইতে পারে যে ভক্তের উপহার আসিয়া পৌঁছিল না। সেদিন কি করেন?"

সাধুবাবা বলিলেন, "একটু ভুল করিয়াছ। ইহা ভক্তের উপহার নহে,—ভগবানেরই উপহার। আমার কায আমি করিয়া যাই, তাঁহার কায তিনি করেন।"

মনে হইল, লোকটি ভক্তির উপযুক্ত বটে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

"রাজীবলোচন ঘোষাল।"

আমার অন্যান্য পরিচয়ও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্তই বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে—আর তুমি পাঠে অবহেলা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

আমি বলিলাম, "অর্থকরী বিদ্যায় আমার চিত্ত নাই। সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গেই আমার পক্ষে আনন্দপ্রদ।"

সাধুবাবা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "দেখ, পথ অনেক আছে। যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই পথ ধরিয়া চলাই কর্ত্তব্য। এক পথে দাঁড়াইয়া, অপর পথের পানে প্রলুব্ধ দৃষ্টিপাত করিলে, অপর পথেও তুমি পেঁাছিলে না, অথচ যে পথে আছ সে পথেও অগ্রসর হইতে পারিলে না। যে পথে থাক, আশে পাশে তাকাইবে না, সম্মুখে সিধা তাকাইবে। এই জন্যই ত ঘোড়ার চোখে দুইটা ঠুলি বাঁধিয়া দেয়; ঘোড়া কেবল সম্মুখের পথই দেখিতে পায়, সম্মুখে ছুটিয়া চলে।"

এখন হইলে এ যুক্তির মধ্যে ছিদ্র ধরিতে পারিতাম; কিন্তু তখন ইহা শুনিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। মনে হইল, হাঁ—এইবার একটি প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়াছি বটে। তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বলিলেন, "আগে আরব্ধকার্য্য সমাপ্ত কর। পরীক্ষা হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কাছে আসিও।"

আমি বলিলাম, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ততঃ আর একবার মাত্র আপনার শ্রীচরণদর্শন করিতে আজ্ঞা করুন।"

"তোমার পরীক্ষা কবে?"

"এই সোমবার দিন।"

"আচ্ছা, সোমবার প্রভাতে একবার আমার কাছে আসিও। আমার 'শ্রীচরণ-দর্শন করিবার জন্য নহে,—তোমায় পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমায় কোনও আবশ্যক কথা বলিব।"

কিয়ংক্ষণ কথোপকথনের পরে, আমি উঠিবার সঙ্কল্প করিতেছি, সাধুবাবা বলিলেন "সাধুসেবা করিবার তোমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা,—একটা কায কর দেখি।"

আমি যেন নিজেকে ধন্য মানিয়া বলিলাম,—"আজ্ঞা করুন।"

বাবা বলিলেন, "ঐখানে কমণ্ডলুটা আছে, গঙ্গা হইতে জল ভরিয়া লইয়া আইস।"

আমি জল আনিয়া রাখিলাম। সাধুবাবা অন্যদিকে চাহিয়া, অন্যমনে বলিলেন—"Thanks."

সাধু সন্ন্যাসীর মুখে "Thanks"ও এই প্রথম শুনিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাসায় আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। এই পাঁচদিন অনবরত অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষার দিন প্রভাতে উঠিয়া সাধুদর্শন করিতে চলিলাম।

আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে কি আবশ্যক কথা সাধুবাবা বলিবেন, এ বিষয়ে আমার মনে একটা কৌতূহল হইয়াছিল। বাসার সকলের কাছে সাধুবাবার গল্প করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল—"বোধ হয় কোনও প্রশ্ন-টশ্ন বলে দেবেন। ওঁদের ভূত ভবিষ্যৎ সবই জানা আছে কিনা।"—আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। গুজব শুনা গিয়াছে, ঐ সাধুবাবা ইংরাজিতে একজন ব্যুৎপন্ন লোক,—তিনি নাকি এম-এ পাস! সুধাংশুবাবু নামক আমার একজন সহপাঠী—তিনি এম-এ পাস শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"এম-এ পাস না হাতী পাস।"—তাহার পর হইতে রাগে সুধাংশুবাবুর সহিত আমি ভাল করিয়া কথা কহিতাম না।

গঙ্গাতীরে গিয়া প্রথমে স্নান করিলাম। স্নানান্তে, সিক্ত বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া, সাধুবাবার কুটীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

তখন সেই মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, কুটীরের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে বসিয়া সাধুবাবা ধ্যানস্থ।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকার পর সাধুবাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আজ তোমার পরীক্ষা?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমায় আজ কিছু বলিব বলিয়াছিলাম। তাহা অতি সামান্য কথা, অথচ প্রয়োজনীয় কথাও বটে। দেখ, আর্য্যধর্ম্মে পুরাকাল হইতে ফুল দিয়া দেবতার পূজা করিবার কেন ব্যবস্থা আছে বলিতে পার?"

আমি বলিলাম, "ফুল সুগন্ধপূর্ণ জিনিষ, দেবতার প্রীতির জন্য ফুল দিয়া পূজা করা হয়।"

সাধুবাবা বলিলেন, "ভুল। দেবতা নির্ব্বিকার। ফুলের গন্ধে তাঁহার প্রীতি হইবে কি করিয়া? না, ফুল দেবতার প্রীতির জন্য নহে,—পূজকের প্রীতির জন্যই। ফুলের

গন্ধে পূজকের মনে আনন্দের ভাব হইবে বলিয়া। আনন্দপূর্ণ মনে কোনও কার্য্য করিলে তাহা যেমন সফল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। তুমি বাসায় ফিরিবার সময় এক শিশি সুগন্ধি দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইও। যদি দেশী পাও ত বিলাতী কিনিও না, কারণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহবর্দ্ধন করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। সেই সুগন্ধি রুমালে, চাদরে একটু মাখিয়া পরীক্ষালয়ে যাইবে। মন ভাল থাকিলে ভাল লিখিতে পারিবে।"

আরও দুই চারি কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের শেক্সপিয়রের কি কি নাটক পাঠ্য আছে?"

আমি বলিলাম, "Hamlet, Julius Caesar ও Tempest."

সাধুবাবা বলিলেন, "আহা, Hamlet! উহার তুল্য পুস্তক আর কোনও ভাষায় পাঠ করি নাই।" বলিয়া—"To be, or, not to be, that is the Question." হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিলেন।

সাধুবাবা যে এম-এ পাস এ সম্বন্ধে তখন আর আমার অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

বাসায় ফিরিলে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, বাবাজী কি বললেন?"

আমি সকল কথাই বলিলাম। শুনিয়া দুই একজন বলিল, "দেখ লোকটা এম-এ পাস হোক্ না হোক্,—বুজরুক নয়।" কেহ বলিল, "লোকটার উপর ভক্তি হচ্ছে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক, একদিন দেখতে যেতে হবে।"

আমি মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিয়া রাখিলাম পরীক্ষাটা হইয়া যাউব—ইহাদিগকে একবার লইয়া দেখাইয়া আনিব,—সাধুবাবা কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি। ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, বিশেষতঃ সুধাংশুকে দেখাইব, সাধুবাবা কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই বাসার কয়েকজন লইয়া সাধুদর্শনে চলিলাম। গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল। এই সাধুবাবা যেন বিশেষ করিয়া আমারই সম্পত্তি—দেখুক সকলে, দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হউক। যাহারা গৈরিক বসনে, জটা ধারণ করিয়া, ভস্ম মাখিয়া বেড়ায়, তাহারা যে সকলেই "হাম্বাগ" নহে,—তাহা দেখুক উহারা।

মাঠের ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে হয়। বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, কুটীর শূন্য, কিন্তু তাহার চারিপাশে অনেক লোকের

সমাগম হইয়াছে। সাধুবাবা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কতিপয় লোক বলিল—'সাধুবাবা! এই কতক্ষণ হইল সাধুবাবাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি কলকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জাল চেক ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজার টাকা লইয়া সট্‌কা ইয়াছিলেন। ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল। এই কতক্ষণ হইল ডিটেকটিভ পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।'

আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সুধাংশু আমার পানে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাতে বন্দুক থাকিলে আমি তাহাকে গুলি করিয়া ফেলিতে পারিতাম।

[মাঘ, ১৩১১]

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালাজাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখা-পড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত একযোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, "চতুরি—ভাং তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছুদূরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা একা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপ্যালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ

করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলায় শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাব-ছড়ী।"

গুলাবছড়ি-ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোক সহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ী!
যো খাওয়ে— মজা পাওয়ে;
যো চাখ্‌খে— ইয়াদ্‌ রাখ্‌খে;
গুলাব-ছড়ী!

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, "ভাইয়া, আমি গুলাব-ছড়ি খাইব।"

একথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, 'গুলাব-ছড়ি, নানখাটাই, সোহন হালুয়া,—কি লইবে বল।"

বালক গুলাব-ছড়িরই বেশী পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাবছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পসরা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম সুরে "গুলাব ছড়ি" হাঁকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, "দেখ ভাইয়া, একটা হাঁথীর তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—"বিবাহের বিজ্ঞাপন।"

বামহস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল :—

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের

জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

লালা মুরলীধর লাল
মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট,
বেনারস সিটি।

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে ;—নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম? "প্রার্থনাসমাজী'র কন্যা। বাঙ্গালা দেশে যে "বরম্‌সমাজী'রা আছে—'প্রার্থনাসমাজী'রাও সেইরূপ, তাহা রাম আওতার শুনিয়াছে। এতদিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতুহল সঞ্চিত ছিল।

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, "একটা কায করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন! তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।"

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মৎলব মনে আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া? কিছুদিন কোর্টশিপ্ করিয়া তাহার পর চম্পট। রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে হইবে। রাম অওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোষে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—"শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।" তাহার পর মনে হইল, ইহারা "প্রার্থনাসমাজে"র লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত চটিয়া যাইতে পারে! তাহাকে নিতান্ত অসভ্য পৌত্তলিক মনে করিতে পারে! সুতরাং আর একখানা কাগজে শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি" বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল

শুনিলে পাছে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল সে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ করিল।

সেদিন রাত্রে রাম অবতারের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদারঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে শতরঞ্চ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। একজনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থুল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই দুই ব্যক্তি কাশীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ীর অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কাহ্নাইয়ালাল,—সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকরেদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "চিঠি আসিয়াছে।"

কাহ্নাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটি, কেদারঘাট, বেনারস সিটি।" পড়িয়া কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর ত দুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে!"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "লালা মুরলীধর ত নক্‌নৌ বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল্, দেখ্ কি সমাচার।"

কাহ্নাইয়া বলিল, "মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?"

মহাদেও বলিল, "আরে—কি সমাচার সে ত আগে দেখিতে হইবে। খোল্—পড়্।"

কাহ্নাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যাবিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন

সংবংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি-এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস করিতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; একারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র এবং সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—ইতি,

লালা রাম অওতার লাল,
মহল্লা গোরাবাজার, সহর গাজিপুর

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ ত বড় তামাসা! সে সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"বলিতেছে যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?"

মহাদেও বলিল, "জান না? লালা মুরলীধর অখ্‌বারে নুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল কিনা। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে ত ভাল কায়েথ কিরিয়া করম করিবে না। তাই নুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল।"

"আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।"

"হাঁ হাঁ—কায়েথ বটে কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিষ্টর হইয়া আসিয়াছিল।—কায়েথ বটে, বড় ঘরনাও বটে। নুটিস পড়িয়া সে সময় আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বালিষ্টরি পাস করা জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এই বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।"

কান্হাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঐ যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাপ পাঠাইতে সে কি?"

মিশ্র বলিল, "জান না? ঐ যে তসবীর হয়; একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে; মানুষকে সমুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তসবীর উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাপ বলে।"

কান্হাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, "ওঃ হো ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শিকার জুটিয়াছে। উহাকে চিঠি লিখিয়া আনান হউক।"

মহাদেও মিশ্র বলিল, "তাহার কাছে আর কি মিলিবে? দুই চার দশ টাকা

মিলিবে কিনা সন্দেহ।”

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, “না। সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোণার ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিরাপটার কি করি?”

মহাদেও বলিল, “সে জন্য ভাবনা কি? ফোটুগিরাপ বাজারে অনেক মিলবে। চৌকে যে মহম্মদ খানের দোকান আছে কি না, সেখানে পার্সী থিয়েটর দলের অনেক খাপসুরৎ আউরতের তসবীর আছে। সেই একখানা কিনিয়া পাঠাইলেই হইবে।”

পরা মর্শ তখনই স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিসে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইয়া, সেই খানে লইয়া গিয়া। কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এক পোয়া ভাঙ, সঙ্গে একটু ধুতুরার রস—আর কিছুই করিতে হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানাটিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধূমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আসিবার আর বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরণে শাড়ীখানি পরিহিত। “বরম্‌সমাজী”দের স্ত্রী-কন্যারা এইরূপ ধরণেই শাড়ী পরিধান করে বটে—তাহা সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখ চক্ষুর গঠন কি সুন্দর! রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল—“বাহবা কি বাহবা। বাহ্, রে বাহ্!”

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল। তাহাতে এইরূপ লেখাছিল:—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যদি আপনি

আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদারঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া আসিবে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফোটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল

পত্র রাখিয়া আবার ফোটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আজ দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি!" বলিয়া, নিজ বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথম দর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কাযকরা সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের শোভাবৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিত লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুইশত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোণার ঘড়ি, সোণার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে ইংরাজি ধরণে এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে "লাল-হীরাকী কথা", "লয়লা-মজনু", "গুল-ই-বকাওলি" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল। প্রথমে আদরের "তু" না বলিয়া সম্মানের "আপ" বলাই সমীচীন হইবে,

—কারণ এসকল মহিমা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কিনা! কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোনও সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারিদিন যাতায়াতের পর একদিন নির্জ্জনে "পিয়ারী" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্যালোচনা ও ভবিষ্য-সুখ কল্পনা করিতে ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট স্টেশনে পৌঁছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পঞ্জাবী কামিজ আবিরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?"

"হঁ। আপনার নাম কি?"

"কিষুণপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"—বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কিষুণপ্রসাদ বলিল, জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না আমার এই পোষাকে আসিবার সময় দুষ্টলোকে পিচকারী দিয়া দিয়াছে।"

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।" তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোষাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টি-পাত না করিয়াই কিষুণপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরণের হইবে। দেখিল তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থলে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণপ্রসাদ ওরফে কাহাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, "চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন"—"চাচাজী।" আর কেহই নয়—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে

কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কাহ্নাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল, "কিষুণ,—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে জলযোগ করাও।"

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কাহ্নাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুণপ্রসাদ বলিল, "আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তি দূর করিতে সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই।"

রাম অওতার অনুরোধ ক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেমন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "আপনি গীতবাদ্য জানেন কি?—আমাদের বাড়ীর মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্য প্রিয়।"

রাম অওতার বলিল, "গীত? গীত?—জানি বইকি? শুনিবে একটা?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চম্ চম্ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"গীত? শুনিবে একটা?" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বিন্দ্রাবন ঢুঁ—

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "কি রে কাহ্নাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?"

কাহ্নাইয়ালাল হাসিয়া বলিল, "ধরিয়াছে বইকি! যায় কোথা?"

মহাদেও বলিল, "দেখ্ ত কি আছে।" কাহ্নাইয়ালাল তখন অচেতন রাম

অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটী, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্য-নির্মিত পানের ডিব্বা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল। মহাদেও টাকাগুলা গণিতে গণিতে বলিল, "পোষাক খোল, দামী পোষাক।"

গুরুজীর আদেশমত কাহ্নাইয়ালাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোষাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে! একটা চিম্‌টা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কাহ্নাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল—"দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টাদুই এইখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার গলি দিয়া লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার লাল ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারবিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্য-বশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় ঐ অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

[বৈশাখ ১৩১১]

স্বর্ণ-সিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে আজ অনেক বৎসরের কথা। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে "প্র্যাক্‌টিস্" আরম্ভ করিলাম, কিন্তু মক্কেল জুটিল না। মাসছয় কাল বার লাইব্রেরীতে বসিয়া অন্যান্য নব্য উকীলগণের সহিত নানাবিধ খোসগল্প করিয়া ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পশ্চিম যাই। কিন্তু পশ্চিমেই বা যাই কোথায়? ডিরেক্টারি

বাহির করিয়া পশ্চিমের নানা স্থানের উকীলের তালিকা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, বিহারে সাসেরাম নামক একটা মহকুমা আছে, সেখানে বাঙ্গালী উকীল একটিও নাই—আর কোনও বাঙ্গালীই নাই। যাইবার পক্ষে বাধাও বিস্তর,—রেল নাই। আরা ষ্টেশনে নামিয়া একা করিয়া তিন চারি দিন যাইতে হয়। ভাবিলাম, এই ঠিক হইয়াছে। এই পৃথিবীর বাহির কাশী—সাক্ষাৎ কৈলাস, এইখানে গেলেই আমার পসার হইবে। পশ্চিমের লোকের বিশ্বাস বাঙ্গালীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি। ওদিকটায় বাঙ্গালীর এখনও বেশ খাতির আছে। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই সাসেরাম পৌঁছিয়া প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিলাম।

সাসেরামে একজন উর্দ্দু'ওয়ালা উকীল ছিলেন,—তাঁহার নাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদ। তিনিই সেখানকার প্রধান উকীল। আমাকে দেখিয়া কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—"আরে উও তো বাচ্চা হায়, কানুনকা হাল ক্যা জানতা হায়?"—প্রথম প্রথম একটা মোকর্দ্দমায় আমি তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলাম। মোকর্দ্দমা শেষে বক্তৃতার দিন আইনের তর্ক করিবার জন্য অপরাধের মধ্যে আমি খানকতক মোটা মোটা পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। জোয়ালা-প্রসাদ কোনও আইনের পুস্তকের ধার ধারিতেন না। প্রকাশ্য আদালতে হাকিমকে বলিলেন—

"হুজুর,—দেখিয়ে তো তমাশা! কল্‌কত্তা সে এক উকীল আয়েহে,—ন মোচ ন দাঢ়ী—ঔর বহুত্ কে লিয়ে টোকড়ি ভরকে কিতাব লে আয়েহে"। হুজুরকো কানুন শিখলানে মাঙ্গতেহে"—যেয়সে কি হুজুরকো কানুন মালুম নেহি হায়!"

হাকিম একটু হাস্য করিয়া উকীল সাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমার প্রতি জোয়ালাপ্রসাদের এই বিদ্বেষের কারণ ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি পাটনা কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। সেই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে সাসেরামের একমাত্র ইংরাজি জানা উকীল হয়, ইহাই মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাসনা ছিল। তাই আমাকে দেখিয়া তাঁহার এত আক্রোশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্পদিনের মধ্যেই আমার পসার হইতে আরম্ভ হইল। একটা বন্ধে কলিকাতায় গিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিলাম। সদর রাস্তার উপর আমার দ্বিতল গৃহখানি। উপরের কক্ষে চিকে ঢাকা জানালাটির কাছে বসিয়া কৌতুকপূর্ণ নেত্রে এই নূতন প্রদেশের নূতনতর জীবন প্রবাহ দেখিতে আমার স্ত্রী ভালবাসিতেন। একদিন রাজপথে কতকগুলি

বালক বালিকা সমবেত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এই গীতটি বারম্বার গাহিতে লাগিল :—

"বাঙ্গালী বিটিয়া,
কল্‌কত্তা মে বেচে তামাকুল টিকিয়া।"

আমার স্ত্রী তখনও হিন্দী শিখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি বলছে গো?"

আমি বলিলাম, "ওরা যা বলছে তার ভাবার্থ এই—হে বাঙ্গালীর মেয়ে,—আমাদের দেশে এসে তোমরা ভারি নবাব্ হয়েছ, চিকের আড়ালে দোতলায় বসে আছ—কিন্তু কলকাতায় তো তোমরা তামাক টিকেও বিক্রি কর শুনেছি।"

আমার স্ত্রী শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে!"

গ্রীষ্মকাল আসিল। আমার বাড়ীর চারিদিকের তালগাছগুলিতে পাসীরা তাড়ির জন্য "লাবনি" বাঁধিয়াছে। প্রত্যহ প্রভাতে চারিদিক হইতে পাসীদের চীৎকার শুনা যায়—"তার চিঢ়ো"—অর্থাৎ—"আমি তালগাছে চড়িতেছি—কুলবধূগণ, তোমরা উঠান হইতে পলায়ন করিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাক।"

গ্রীষ্মের ছুটিতে মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের পুত্রটি পাটনা হইতে আসিল। সহরে ইংরাজি জানা লোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া আমার সহিত তাহার বন্ধুভাব জন্মিল। তাহার নাম সুন্দরলাল। আমি তাহার পিতৃবৈরি হইলেও আমার কাছে সে সর্বদা আসিত। মাঝে মাঝে আমরা একত্র বেড়াইতে যাইতাম। এখনকার বাঙ্গালীদের যেমন "সাহেব" হইবার উচ্চাভিলাষ,—সুন্দরলালের দেখিলাম সেইরূপ বাঙ্গালী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। পিতার অগোচরে সে মাঝে মাঝে আমার গৃহে সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণও রক্ষা করিতে লাগিল।

লোকটিকে আমার বড় ভাল লাগিত। ক্রমে দেখিলাম, সে যে শুধু ইংরাজি-শিক্ষা-লাভ করিয়াছে তাহা নহে, একটি আনুষঙ্গিক ব্যাধিও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। সে ব্যাধিটি দাম্পত্য-বিষয়ক। সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃনির্বাচিত কন্যাকে সে আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বলিল, এই কারণে পিতা তাহার উপর বিরক্ত।

আরও কয়েক দিনে বন্ধুত্ব একটু ঘনিষ্ঠভাব ধারণ করিল। একদিন চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় নদীতীরে আমরা দুইজনে বেড়াইতেছিলাম। সুন্দরলাল সে দিন আমাকে বলিল—সে একটি মেয়েকে ভালবাসে।

শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মনে করিতাম, এই ব্যাধি উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশের বাহিরে এখনও বুঝি প্রবেশ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার নাম কি?"

"পান্না।"

"কত বড় ?"

"তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর।"

দেখিলাম—তবে ত ইহা একটি রীতিমত রোমান্সের কাণ্ড! বন্ধুকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মেয়েটি কোথায় ?"

"আমাদের গ্রামে।"

আমি জানিতাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাড়ী সদর হইতে ছয় মাইল দূরে পাটৌলি গ্রামে। রহস্য করিয়া বলিলাম, "তাই এত ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া হয় বুঝি ?"

সুন্দরলাল বলিল, "কোথায় ঘন ঘন যাই ? আসিয়াই একবার গিয়েছিলাম, আর সেদিন আর একবার গিয়াছিলাম মাত্র। প্রথমবার শুধু দেখা পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাই নাই। তাই দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম।"

হাসিয়া বলিলাম, "এখানে তবে মরিতেছ কেন ? আমি হইলে ত ছুটির কয়টা মাস সেইখানেই থাকিয়া যাইতাম।"

সুন্দরলাল বলিল "আকাঙ্খার যদি অনুসরণ করিতাম, তবে আমিও তাহাই করিতাম। আমি জানি, আমি যদি তাহার কাছাকাছি থাকি, তবে সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিব না। এইরূপ কিছুদিন চলিলে, গ্রামের লোকের মধ্যে কি প্রকার আলোচনা উত্থিত হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি কি তার—"

সুন্দরলাল আর বলিতে পারিল না,—কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম। আমি এতক্ষণ ব্যাপারটিকে পরিহাসের বিষয়স্বরূপই মনে স্থান দিয়াছিলাম। সুন্দরলালের এই কথায় সে ভাব আমার মন হইতে তিরোহিত হইল।

পরিহাসের স্বর পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কে ?

"আমাদের গ্রামে একটি পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ আছেন। তাঁহার নাম সুবেদার অযোধ্যানাথ। পান্না তাঁহার পৌত্রী।"

"তাহারা কি তোমাদের স্বজাতি ?"

"স্বজাতি বইকি !"

"তবে বাধা কি ? তোমার পিতার নিকট তোমার বাসনা কখনও ব্যক্ত করিয়াছিলে ?"

"করিয়াছিলাম। নিজে করি নাই—অন্য লোক দিয়া বলাইয়াছিলাম।

অযোধ্যানাথ আমাকে তাঁহার নাতজামাই করিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কুলগত কোনও দোষ আছে বলিয়া, জাতিভয়ে পিতা কিছুতেই সম্মত হন নাই। সে মেয়ের আরও অনেক স্থলে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সম্মত হয় না। নহিলে আমাদের ঘরে অত বড় মেয়ে কখনও অবিবাহিত থাকে ?"

শুনিয়া আমার মন কিছু বিষণ্ণ হইল। এ যে উপন্যাসের মতই কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছি। কিন্তু উপন্যাসে সুখ-সম্মিলনটা প্রায়ই কোন না কোনও উপায়ে সংঘটিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কি তাহা হইবে না ?

তাহার পর সুন্দরলাল অনেক কথা বলিল। সকল কথাই তাহার প্রণয়িণীর সম্বন্ধে। সুন্দরলাল স্পষ্ট বলিল—প্রণয়ের আবেগটা সমস্ত তাহার তরফ হইতে। বালিকা সম্ভবতঃ ভালমন্দ কিছুই জানে না। তাহার জানিবার বয়সও নহে, সুযোগ ঘটে নাই।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রে আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার পর আর দুই মাস কাটিল। আমার বেশ পসার হইয়া আসিতেছে। এখন প্রত্যেক বড় মোকর্দ্দমায় কোন না কোন পক্ষে আমি নিযুক্ত থাকি। সুন্দরলাল পাটনায় ফিরিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে কয়েকবার সুন্দরলালের সহিত তাহাদের গ্রামে গিয়াছিলাম। সুবেদার অযোধ্যানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। দূর হইতে অতর্কিতে আমার বন্ধুর মনোহারিণীকেও দেখিয়া আসিয়াছি। মেয়েটি বেশ সুন্দরী বটে। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া সুন্দরলালকে দোষ দিতে পারা যায় না।

প্রথম যেদিন পাটোলি হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, আমার স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পান্নাকে দেখলে ?"

"দেখলাম বইকি।"

"কেমন দেখতে গো ?"

জ্ঞানীজনেরা বলিয়া থাকেন, নিজের স্ত্রীর সমক্ষে কখনও অন্য কোন স্ত্রীলোকের রূপের প্রশংসা করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "দেখতে মন্দ কি ?"

স্ত্রী বলিলেন, "তবু কি রকম দেখতে, কি রকম রঙ, মুখ চোখ কি রকম ?"

বলিলাম, "তা—ভালই।"

আমার উত্তরে আমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব সুন্দরী?"

পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "কি জানি অত বুঝিসুঝিনে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আহা কথার শ্রী দেখ। কচি খোকা কিনা—কিছু বোঝেন না! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি সুন্দরলাল হতে, তা হলে তুমি ভালবাসতে কি না?

আমি দুষ্টামি করিয়া বলিলাম, "কাকে? তোমাকে?"

শ্রীমতী রাগিয়া বলিলেন, "গা জ্বালা করে কথা শুনে। পান্নাকে—পান্নাকে।"

"আমি যদি সুন্দরলাল হতাম?"

"হাঁ গো হাঁ। একটা কথা বুঝতে পার না? এত পাস করলে কি করে?"

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে হইবে জ্ঞানীজনেরা তাহার কোনও নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং কপাল ঠুকিয়া বলিলাম, "তা, বাসতাম বোধ হয়।"

কপাল ঠুকিয়া বারুদের বাক্সতে দিয়াশলাই ধরাইয়া দিলাম না কেন? ফল ইহা অপেক্ষা গুরুতর হইত না।

অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গাইলাম। মানান্তে তিনি পান্নার পরিজনাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রায় সকলগুলিরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম।

সুবেদারজী লোকটি বড় ভাল। ঐ কন্যাটি তাঁহার সর্ব্বস্ব। বলেন, ইচ্ছা করিলেই এখনি তাহার বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু মেয়েটিকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া কি লইয়া থাকিবেন? আজীবন তিনি যুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহার অনেক গল্প করিলেন।

আষাঢ় মাস। রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। সহসা কি একটা শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কাণ পাতিয়া রহিলাম। দরজার বাহির হইতে শব্দ আসিল—"বাংগালীবাবু—এ বাংগালীবাবু।"

আমার নাম এখানে অল্প লোকেই জানে। সাধারণে আমি "বাংগালী উকীল" অথবা "বাংগালীবাবু" বলিয়াই পরিচিত।

পুনশ্চ শব্দ হইল—"বাংগালীবাবু—এ বাবুজী।"

আমি "কোন্ হায়?" বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

"ত্যারা বাহার তো আইয়ে।"

আমার স্ত্রীও জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কোনও অমঙ্গলের টেলিগ্রাম এসেছে

বুঝি।”

বাতি জ্বালাইয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া বাহির হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি—কিন্তু আকাশে আকাশে অল্প মেঘ ছিল, তাই জোৎস্না ম্লান দেখাইতেছিল। তালগাছগুলি কাঁপাইয়া সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। উঠানের পার্শ্বে টগরগাছে একগাছ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

সদর দরজা খুলিয়া দেখি, একটি অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। “কে তুমি ?”

লোকটি বলিল, মোহাক্কেল।”

“এত রাত্রে কেন ?”

“একটি বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। উইল করিতে হইবে। এখনি না গেলে নয়। ভোর অবধি তাঁহার নিঃশ্বাস থাকিবে কিনা সন্দেহ।”

“কত দূর যাইতে হইবে ?”

“বেশী নয়। এখান হইতে দুই তিন ক্রোশ মাত্র।”

“যাইব কি করিয়া ?”

“ঘোড়া আনিয়াছি ?”

“ফীজ আনিয়াছ ?

“আনিয়াছি! কত লাগিবে ?”

“এই রাত্রে আমি একশত টাকার কমে যাইব না।”

“এই লউন।”—বলিয়া লোকটি তাহার চাদরের প্রান্ত হইতে টাকায় নোটে একশত টাকা গণিয়া দিল।

আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বাটির ভিতরে প্রস্তুত হইতে গেলাম। টাকাগুলি বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে, আলিপুর বারের সেই নিরন্ন দিনগুলির কথা মনে পড়িল। সেই একদিন আর এই একদিন। তখন সারাটা দিন কাছারিতে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়াও মক্কেল-দেবতার দর্শন পাওয়া যাইত না;—আর এখন সেই দেবতা দুই প্রহর রাত্রে আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া ঘুমটুকু নষ্ট করিয়া দিল।

গৃহিণীকে অভয় দিয়া, ভৃত্যগণকে জাগাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। অশ্বারোহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বৃদ্ধটি কে ?

আমার সঙ্গী বলিল, “সুবেদার অযোধ্যানাথ।”

“সুবেদারজী ? তাঁহারই আসন্নকাল উপস্থিত ?”—বলিয়া আমি দুঃখে মৌন হইয়া রহিলাম। এই যে পনেরো দিন হইল তাঁহার কাছে বসিয়া কত যুদ্ধকাহিনী শ্রবণ

করিয়া আসিয়াছি।

ঘণ্টাখানেক অশ্বারোহণের পর আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত গ্রামটিতে গিয়া উপনীত হইলাম।

সুবেদারজী আমাকে বলিলেন, "বাবু আসিয়াছেন? আসুন—বসুন। আমি ত চলিলাম।"

আমি বলিলাম, "না সুবেদারজী। ও কথা কেন বলেন? আপনি ভাল হইবেন। আবার আপনার কাছে কত যুদ্ধের গল্প শুনিব।"

শুনিয়া সুবেদারজীর মুখে একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই হইবে। এখন আমার নিকট কায করুন। অনেক রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞা করুন।"

সুবেদারজী বলিলেন, "আপনি জানেন বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল, সে বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে—স্বর্গে গিয়াছে। হতভাগ্য আমাকে রোগশয্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইল। রামজীর ইচ্ছা। আমার সেই পুত্রের একটি কন্যা আছে। তাহাকে বুকে করিয়া আমি জীবনের শেষভাগ কাটাইলাম। আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, সে পঞ্জাবে চাকরী করে। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাকে এবং আমার পৌত্রীকে বণ্টন করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনি এই মর্ম্মে একটি উইল প্রস্তুত করুন। আমার একটি স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহ আছে। আমি যখন বর্ম্মাযুদ্ধে গিয়াছিলাম, সেই সময় রাজবাটী লুট করিতে গিয়া সেটি পাই। সিংহটি ওজনে ত্রিশ সেরের উপর। সোণাটার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। আমার পৌত্রীকে যে বিবাহ করিবে, সে ওই সিংহটি যৌতুক পাইবে। আমার লোহার সিন্দুকটিতে ঐ সিংহ রক্ষিত আছে। এ কথা এতদিন কেহ জানিত না। জানিলে ডাকাতেরা আসিয়া সিংহটি লইয়া যাইত। লোহার সিন্দুকে আমার এক হাজার টাকা আছে। ঐ টাকা আমার পৌত্রী পান্নার নামে লিখিয়া দিন। আর আমার এই বাড়ী, সামান্য জমিজমা যাহা আছে, বাসনপত্র, আর মেডেলগুলি, সমস্ত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে লিখিয়া দিন।"

উপরিউক্ত কথাগুলি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া যাইতে লাগিলাম। লিখিবার জন্য কাগজ ভাঁজ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এ উইলের অছি কাহাকে নিযুক্ত করিবেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এই দেখুন। আসল কথাই ভুলিয়া যাইতেছিলাম। অছি আপনি

হইবেন। ইহাও লিখিয়া দিন, আপনার মনোনীত পাত্র পান্নাকে বিবাহ করিলে তবেই সে ঐ সিংহ পাইবে। আপনি সুন্দরলালের বন্ধু। আপত্তি আছে কি?"

আমি বলিলাম, "আমি আহ্লাদের সহিত আপনার উইলের অছি হইতে প্রস্তুত আছি।"

আমি সুন্দরলালের বন্ধু—তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।

উইল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ সহি করিলেন। সাক্ষীদেরও সহি লইলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন, "উইলখানি আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। আর এই লউন আমার লোহার সিন্দুকের চাবি। আপনার পরিবার এখানে আছেন?"

"আছেন।"

"আমার অবর্ত্তমানে তবে আপনি দয়া করিয়া পান্নাকে লইয়া গিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত আপনার বাটীতে রাখিবেন। পান্না নিজে রাঁধিয়া খাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে এই দেশের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আছে। পান্নাকে নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে কেন?"

উঠিয়া বৃদ্ধকে বলিলাম, "এখন আমি চলিলাম। কিন্তু আপনাকে ভাল হইতে হইবে। আরও অনেকদিন আপনাকে বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গল্প বলিতে হইবে।"

বৃদ্ধ অশ্রুগদ্গদ্-কণ্ঠে বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। আপনার হাতে আমার পান্নাকে, আর টাকাকড়ি, সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে পান্নার মঙ্গল হয় তাহাই আপনি করিবেন।"

আমি সুবেদারজীকে আমার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইহার পর একটি দিন মাত্র বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক মাস কাটিয়াছে। সুবেদারজীর শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গিয়াছে।

পান্নাকে আনিয়া আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া দিয়াছি। তাহার টাকা ও সিংহযুক্ত লোহার সিন্দুকটি আনিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

প্রথম কয়েকদিন পান্না পিতামহের শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। আমার স্ত্রীর শুশ্রূষার গুণে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন রবিবার, প্রভাতে উঠিয়া চা খাইতেছি, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল বাবু

জোয়ালাপ্রসাদ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমাকে এ অনুগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি করেন নাই।

আমি মাঝে মাঝে সুবেদারজীর সিন্ধুকটি খুলিয়া সেই স্বর্ণ-কেশরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম, আর ভাবিতাম, এখনও বাবু জোয়ালাপ্রসাদ এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিতেছেন না কেন ?

বাহিরে গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উকীল সাহেবকে বসাইলাম। দুই এক কথার পর তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপনার জন্ত আমাদের ত বড় নিন্দা হইয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

"আমাদের জাতি-ভাই সকলেই বলিতেছে যে বুড়া মরিয়া গেল, তাহার পৌত্রীটা খাইতে না পাইয়া শেষে বাঙ্গালীর অন্ন খাইতেছে—জাতি-ভাই কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "খাইতে না পাইয়া ? কেন, পান্না ত একেবারে নিঃস্ব নহে, সুবেদারজী উইল করিয়া তাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি শুনেন নাই ?"

জোয়ালাপ্রসাদ বিস্মিতের মত বলিলেন, "উইল করিয়াছেন ? তাঁহার ছিল কি যে তিনি উইল করিবেন ? আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

উকীল সাহেবের এই অভিনয়টুকু দেখিয়া মনে মনে আমোদ অনুভব করিলাম। অমায়িকভাবে বলিলাম, "না, উইল করিয়া গিয়াছেন। আমিই সে উইল লিখিয়াছি।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তা ভাল। বাড়ীটি আর দুই-দশ টাকা যাহা বুড়ার ছিল, তাহা উইল করিয়াছেন বোধ হয়। তাহা বুদ্ধির কার্য্যই হইয়াছে। ঐ যে পান্নার পিতা সে বুড়ার বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান ছিল না বলিয়া একটা গুজব আছে কিনা। উইল না করিলে সম্ভবতঃ ও বাড়ীটি বুড়ার ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া দখল করিত। ওকালতী করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, সবই বুঝিতে পারি।"—বলিয়া তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন।

লোকটার মুখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আসল, কথাটাই তাঁহার মনে তোলাপাড়া করিতেছে, অথচ প্রকাশ করিবার সাহস হইতেছে না।

নানা অসম্বদ্ধ কথা পড়িয়া, নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, অবশেষে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। পান্নার সহিত সুন্দরলালের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

আমি মনে মনে বলিলাম, "হে স্বর্ণ-কেশরী—তোমার মহিমা !"

জোয়ালাপ্রসাদকে বলিলাম, "মেয়েটির ঐ যে কুলগত দোষ আছে—তাহাতে

আপনার জাতি-ভাই কোনও আপত্তি করিবে না ত ?”

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, “করিবে। আমি বিলক্ষণ জানি—তাহারা আমাকে একঘরে করিবে। কিন্তু আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি নির্ব্বোধ সমাজ-শাসনের এত ভয় করিয়া চলি, তাহা হইলে দেশের কুসংস্কারাপন্ন রীতিনীতিগুলি কি কখনও সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে করেন নবীনবাবু ?”

অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীরভাবে আমি মাথাটি নাড়িতে লাগিলাম। বলিলাম, “ঠিক ঠিক—উকীল সাহেব। আপনি আপনার বিদ্যাবত্তার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।”

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, “ইংরাজি পড়ি নাই বটে,—কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতাদি ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মতই।”

আমি পূর্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলাম, “তা বটেই ত! তা বটেই ত!”

জোয়ালাপ্রসাদ বোধ হয় মনে করিলেন, তাঁহার এ ভণ্ডামিটুকু আমি ধরিতে পারি নাই। তাই উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা নবীনবাবু, আপনি ত সুন্দরলালের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বস্থাপন করিয়াছেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি সম্প্রতি শুনিলাম—সুন্দরলাল পান্নাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল। তাহা সত্য কি ?”

আমি বলিলাম, “সত্য।”

জোয়ালাপ্রসাদ উৎসাহের সহিত বলিলেন, “তবে আমার মনের সকল দ্বিধাই এখন কাটিয়া গেল। হউক পান্না কু-জাতি—হউক সে অর্থহীনা—আমার পুত্র যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে—আমি তাহাকে পুত্রবধূ করিব। আমার পুত্রের সুখ, বড়, না আমার জাতি বড়, নবীনবাবু ?”

হাস্যের এত প্রচণ্ড শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা আমার আছে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে বলিলাম, “অবশ্য আপনার পুত্রের সুখই বড়, উকীল সাহেব।”

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, “তবে আপনার মত আছে ?

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিলাম। জোয়ালাপ্রসাদের মুখ কালিমা-ময় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তবে বুঝি বা আমি অমত করি।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, “সুন্দরলাল যখন আপনার প্রিয় বন্ধু, তখন অবশ্যই তাহার শুভ ইচ্ছা আপনি করিবেন।”

শেষে আমি বলিলাম—“আমার মত আছে।”

শুনিয়া স্বর্ণলোভী বৃদ্ধ আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রথমে স্বর্ণ-সিংহের অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞতার ভাণটুকু দেখাইতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এখন এই অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু গোপন করিতে সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অন্য সকল চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা, প্রবল আনন্দ গোপন করাই বোধ হয় মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

পান্না-সুন্দরলালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উইলের প্রোবেট লইয়াছি। পান্নার হাজার টাকা, তাহার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। সিংহটি জোয়ালাপ্রসাদ লইয়া গিয়াছেন।

বিবাহের সপ্তাহখানেক পরে, আবার নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া আমার সদর দরজায় শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—এ লোবিন বাবু!"

জাগিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, "আবার কাহারও উইল করিতে হইবে নাকি?"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, লণ্ঠনহস্তে একটা ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে পান্না ও সুন্দরলাল।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে? ব্যাপার কি?"

"ভিতরে চল—বলিতেছি।"

ভৃত্যকে বিদায় দিয়া সুন্দরলাল পান্নাকে লইয়া আমার অঙ্গনে প্রবেশ করিল। বলিল, "বাবা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"কেন?"

"সে সোণার সিংহটা সমস্ত সোণার নহে। খুব পাতলা সোণার পাতে উপরটা মোড়া ছিল। ভিতরটা সমস্ত তামা। বাবা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া বিক্রয় করিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখিবেন; নহিলে ডাকাইতে কোন্‌দিন সিংহটা লইয়া যাইবে আজ সন্ধ্যা হইতে গলানো হইতেছিল। দুইশত টাকার আন্দাজ সোণা বাহির হইয়াছে—বাকী সমস্ত তামা; বাবা ক্রোধে ক্ষিপ্তের মত হইয়াছেন। দূর দূর করিয়া আমাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"

আমার স্ত্রী অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া পান্নার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজকক্ষে লইয়া গেলেন। আমি সুন্দরলালকে লইয়া একটি কক্ষে বসিলাম।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১]

ফুলের মূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন নগরের স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে। আমি একদিন ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে, সেণ্ট মার্টিন্স লেনে এইরূপ একটি ভোজনশালা আছে,—মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ করিলাম।

তখনও লণ্ডনের ভোজনশালাগুলিতে লাঞ্চের জন্ম বহুলোক সমাগম আরম্ভ হয় নাই। হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই চারিটি মাত্র ক্ষুধাতুর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়া আছে। আমি গিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, দৈনিক সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইলাম। নম্রমুখী ওয়েট্রেস্ আসিয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ, মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস্ নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এই মুহূর্ত্তে, আমার নিকট হইতে অল্প দূর আর একখানি টেবিলের প্রতি আমার নজর পড়িল। দেখিলাম সেখানে একটি ইংরাজ-বালিকা বসিয়া আছে। তাহার পানে চাহিবামাত্র, সে আমার মুখ হইতে নিজ দৃষ্টি অন্যত্র ফিরাইয়া লইল। অবাক হইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল।

ইহাতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই, কারণ শ্বেতদ্বীপে আমাদের চমৎকার দেহবর্ণটির প্রভাবে জনসাধারণ সর্ব্বত্রই মোহিত হইয়া থাকে, এবং মনোযোগের অংশ, প্রাপ্যের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রাতেই আমরা লাভ করি।

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। তাহার পোষাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যঞ্জক। চুলগুলি অজস্রধারায় পিঠের উপর পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু দুইটি বৃহৎ, যেন একটু বিষণ্ণতাযুক্ত।

সে জানিতে না পারে এমনভাবে আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতে লাগিলাম। আমার খাদ্যদ্রব্যাদি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আহার সমাধা করিয়া উঠিল। ওয়েট্রেস্ আসিয়া তাহার বিলখানি তাহাকে লিখিয়া দিল। বাহির হইবার দরজার নিকট আফিস আছে, সেখানে বিলখানি ও মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অনুসরণ করিল। স্বস্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহার মূল্য প্রদান করিয়া, কর্ম্মচারিণীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা

করিতেছে—"Please Miss, ঐ যে ভদ্রলোকটি, উনি কি ভারতবর্ষীয় ?"

"আমার তাহাই অনুমান হয়।"

"উনি কি সর্ব্বদাই এখানে আসেন ?"

"বোধ হয় না। আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ নাই।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া, আর একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবার কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম। কেন ? ব্যাপার কি। আমার সম্বন্ধে তাহার এই কৌতূহল দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে ওয়েট্রেস্‌কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ যে মেয়েটি ওখানে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জান ?"

"না মহাশয়, আমি ত বিশেষ জানি না, তবে প্রতি শনিবারে এখানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।"

"শনিবার ছাড়া অন্য কোনও বারে আসে না ?"

"না, আর ত কখনও দেখি না।"

"ও যে কে তাহা তুমি কিছু অনুমান করিতে পার ?"

"বোধ করি কোনও দোকানে কর্ম্ম করে।"

"কেন বল দেখি ?"

"হয়ত সামান্য কিছু উপার্জ্জন করে, অন্য দিন লাঞ্চ খাইবার পয়সা কুলায় না, শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন পায়, তাই একদিন আসে।"

কথাটা আমার মনে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকাটির সম্বন্ধে কৌতূহল আমার মন হইতে দূর হইল না। এমন করিয়া আমার সংবাদ হইল কেন ? ভিতরে এমন কি রহস্য আছে, যাহার জন্য আমার সম্বন্ধে উহার এত ঔৎসুক্য ? তাহার সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, চিন্তাপূর্ণ বিষাদভরা মূর্ত্তি আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। আহা, কে বালিকা ? আমার দ্বারায় তাহার কি কোনও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে ? রবিবার দিন লণ্ডনের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। সোমবার দিন প্রাতরাশের পর আমি বালিকার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সেণ্ট মার্টিন্স লেনের কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে, বিশেষতঃ ষ্ট্র্যাণ্ডে অনেক দোকানে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোনও

একটা দোকানে প্রবেশ করিলে, অন্ততঃ কিছু না কিছু ক্রয় করিতে হয়। অনাবশ্যক নেকটাই, রুমাল, কলারের বোতাম, পেন্‌সিল, ছবিপোষ্টকার্ড প্রভৃতি আমার ওভারকোটের পকেটে স্তূপাকার হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথাও বালিকার সন্ধান পাইলাম না।

* ইহা কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে নহে, কতকটা দয়াধর্ম্মের অনুরোধও বটে। লণ্ডনের প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পুরুষ Shop-walkers আছে। তাহাদের কর্ত্তব্য, খরিদ্দারকে যথাবিভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে কার্য্যকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা। যদি কোনও খরিদ্দার কোনও বিভাগ হইতে জিনিষ দেখিয়া কিছু না কিছু কিনিয়া ফিরিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সেই Shop-walker দোকানের ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়া থাকে "Miss অমুকের বিভাগ হইতে একজন ক্রেতা ফিরিয়া গিয়াছে।" এইরূপ রিপোর্ট হইলে সেই কর্ম্মচারিণীর কৈফিয়ৎ তলব হয়। প্রথম প্রথম সাবধান করিয়া দেওয়া হয়, বারম্বার এইরূপ রিপোর্ট হইলে জরিমানা হয়, কর্ম্মচ্যুতিও হইতে পারে। এই সকল Shop-girls অত্যন্ত সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিয়া থাকে। জিনিষ অপছন্দ হইলেও, তাহাদের চক্ষুর মিনতি উপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসা দুঃসাধ্য।—লেখক।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শনিবার আসিল। আমি আবার সেই নিরামিষ ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই টেবিলে বালিকা ভোজনে বসিয়াছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া, তাহার সম্মুখের চেয়ারখানি দখল করিয়া বলিলাম—"Good afternoon".

বালিকা সঙ্কোচের সহিত বলিল—"Good afternoon, Sir."

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া, আমি ক্রমে জমাইয়া তুলিতে লাগিলাম। বালিকা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভারতবর্ষীয় ?

"হাঁ।"

"আমায় ক্ষমা করিবেন,—আপনি কি নিরামিষভোজী ?"

উত্তর না দিয়া বলিলাম, "কেন বল দেখি ?"

"আমি শুনিয়াছি, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই নিরামিষ ভোজন করে।"

"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কথা কেমন করিয়া জানিলে ?"

"আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভারতবর্ষে সৈন্য হইয়া গিয়াছেন।"

আমি তখন উত্তর করিলাম, "আমি প্রকৃত নিরামিষভোজী নহি ; তবে মাঝে মাঝে আমি নিরামিষ ভোজন করিতে ভালবাসি বটে।"

শুনিয়া বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল।

জানিলাম, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। ল্যাম্বেথে বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত সে বাস করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দাদার নিকট হইতে পত্রাদি পাও?"

"না, অনেকদিন কোনও পত্রাদি পাই নাই। সেইজন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা করিতেছেন আমার ভ্রাতার কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ মহাশয়?"

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, "না। তাহা হইলে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত?"

বালিকা একটি মৃদুরকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, "মা বলেন, যদি কোনও ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া, অনুনয়পূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিল।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীতে মার কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না, অথচ ইচ্ছা আমি একবার যাই।

এই দীন, বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটীরের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের অবসর আমার কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

বালিকাকে বলিলাম, "চল না—আমাকে তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইবে? তোমার মার নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিবে?"

এ প্রস্তাবে বালিকার দুইটি চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। বলিল, "Thank you ever so much,—it would be so kind of you! এখন আসিতে পারিবেন কি।"

"আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন কার্য্যের ক্ষতি হইবে না ত?"

"না—না, মোটেই না। আজ অপরাহ্নে আমার সময় সম্পূর্ণ আমার নিজের।"

শুনিয়া বালিকা পুলকিত হইল। আহার সমাধা করিয়া আমরা দুইজনে উঠিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নামটি কি জানিতে পারি?"

"আমার নাম অ্যালিস মার্গারেট ক্লিফর্ড।"

রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"ওঃ হো তুমিই Alice in Wonderland-এর অ্যালিস বুঝি ?"

বিস্ময়ে বালিকা চক্ষুস্থির করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি ?"

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। মনে করিতাম, এমন কোনও ইংরাজ বালিকা নাই, যে Alice in Wonderland নামক সেই অদ্বিতীয় শিশুরঞ্জন পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে নাই।

বলিলাম, 'সে একখানি চমৎকার বহি আছে। পড় নাই ?"

"না, আমি ত পড়ি নাই।"

বলিলাম, "তোমার মাতা যদি আমায় অনুমতি করেন, তবে আমি তোমাকে সে বহি একখানি উপহার দিব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, সেণ্ট মার্টিন্স চার্চ্চের পাশ দিয়া চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্ট্রাণ্ড দিয়া হু হু করিয়া বৃহদাকার দ্বিতল অম্নিবসগুলি উভয় দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ক্যাবেরও সংখ্যা নাই। টেলিগ্রাফ আফিসের সম্মুখে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া বালিকাকে বলিলাম, "এস, আমরা এইখানেই ওয়েষ্ট-মিনষ্টার বাসের জন্য অপেক্ষা করি।"

বালিকা বলিল, "চলিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না ?"

"না, আমি ত রোজই চলিয়া বাড়ী যাই।"

কোথায় সে কর্ম্ম করে, এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। ইংরাজি হিসাবে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা নিয়ম নহে, কিন্তু সকল নিয়মেরই ফাঁকি আছে কিনা। যেমন রেলগাড়ীতে উঠিয়া সহযাত্রীকে, "কোথায় যাইতেছেন মহাশয় ?" জিজ্ঞাসা করা ভয়ানক পাপ, তবে "অধিকদূর যাইবেন কি ?" ইহা জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। সহযাত্রী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারে, "আমি অমুক স্থান অবধি যাইব।" ইচ্ছা না করিলে বলিতে পারে, "না এমন বেশী দূর নয়।" আমার প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল, তাহার পর্দ্দাও বজায় রহিল ! সেই হিসাবে আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদিকে তুমি প্রায়ই আস বুঝি ?"

বালিকা বলিল, "হাঁ। আমি সিভিল সার্ভিস ষ্টোর্সে টাইপরাইটারের কাষ করি। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যাই। আজ শনিবার বলিয়া শীঘ্র ছুটি পাইয়াছি।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "চল, ষ্ট্রাণ্ড দিয়া না গিয়া এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়া যাওয়া যাউক। ভীড় কম।" বলিয়া তাহার বাহুধারণ করিয়া সাবধানতার সহিত রাস্তা

পার করিয়া দিলাম।

টেমস্ নদীর উত্তর কূল দিয়া এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট নামক রাস্তা গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিলাম, "তুমি কি সচরাচর এই রাস্তা দিয়াই যাও?"

বালিকা বলিল, "না এ রাস্তায় যদিও ভীড় কম, তথাপি ময়লা কাপড়পরা লোকের সংখ্যা অধিক। আমি তাই ষ্ট্র্যাণ্ড এবং হোয়াইট হল দিয়াই বাড়ী যাই।"

আমি মনে মনে এই অশিক্ষিতা দরিদ্রা বালিকার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। ইংরাজ জাতির সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার নিকট আমার আত্মপরাজয় ইহাই প্রথমবার নহে।

কথোপকথনে আমরা ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রিজের নিকটবর্ত্তী হইলাম আমি বলিলাম, "তোমাকে কি আলিস বলিয়া ডাকিব, না মিস ক্লিফর্ড বলিব?"

মৃদু হাসিয়া বালিকা বলিল, "আমি ত এখনও যথেষ্ট বড় হই নাই। আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে পারেন। লোকে আমাকে ম্যাগি বলিয়া ডাকে।"

"তুমি কি বড় হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত?"

"হ্যাঁ।"

"কেন বল দেখি?"

"বড় হইলে আমি কর্ম্ম করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার মা বৃদ্ধ হইয়াছেন।"

"তুমি যে কর্ম্ম কর, তাহা তোমার মনঃপূত?"

"না। আমার কর্ম্ম বড় যন্ত্রের মত। আমি এমন কর্ম্ম করিতে চাহি, যাহাতে আমার মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। যেমন সেক্রেটারির কায।"

হাউসেস অব পার্লামেণ্টের নিকট পুলিসপ্রহরী পদচারণা করিতেছে। তাহা দক্ষিণে রাখিয়া, ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রিজ পার হইয়া, আমরা ল্যাম্বেথে গিয়া পড়িলাম। ইহা দরিদ্রের পল্লী। ম্যাগি বলিল, "আমি যদি কখনও সেক্রেটারি হইতে পারি, তবে মাকে এ পাড়া হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব।"

ছোটলোকের ভীড় অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার প্রথম নামটি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় নামটি তোমার ডাকনাম হইল কেন?

ম্যাগি বলিল, "আমার মার প্রথম নাম অ্যালিস, তাই আমার পিতা আমার দ্বিতীয় নামটিই সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকিতেন।"

"তোমার পিতা তোমাকে ম্যাগি বলিতেন, না ম্যাগ্‌সি বলিয়া ডাকিতেন?"

"যখন আদর করিয়া ডাকিতেন, তখন ম্যাগ্‌সি বলিয়াই ডাকিতেন। ... কি করিয়া জানিলেন?"

রহস্য করিয়া বলিলাম, "হাঁ হাঁ, আমরা ভারতবর্ষীয় কিনা, আমাদের যাদুবিদ্যা ও ভূত ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় জানা আছে।"

বালিকা বলিল, "তাহা আমি শুনিয়াছি।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বটে! কি শুনিয়াছ?"

"শুনিয়াছি, ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে যাহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাহাদিগকে ইয়োগী (Yogi) বলে। কিন্তু আপনি ত ইয়োগী নহেন।"

"কেমন করিয়া জানিলে ম্যাগি, আমি ইয়োগী নহি?"

"ইয়োগীগণ মাংস ভক্ষণ করে না।"

"তাই বুঝি তুমি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি নিরামিষভোজী কি না?"

বালিকা উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা একটি সম্পূর্ণ গৃহদ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। পকেট হইতে ল্যাচ-কী বাহির করিয়া ম্যাগি দরজা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল, "আসুন!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি প্রবেশ করিলে ম্যাগি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সিঁড়ির নিকট গিয়া একটু উচ্চস্বরে বলিল, "মা, তুমি কোথা?"

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল, "আমি রান্নাঘরে রহিয়াছি বাছা, নামিয়া আইস।"

এখানে বলা আবশ্যক, লণ্ডনের রাজপথগুলি ভূমি হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। রান্না-ঘর প্রায়ই রাস্তার সমতলতা হইতে নিম্ন হয়।

মার স্বর শুনিয়া, আমার প্রতি চাহিয়া ম্যাগি বলিল, "Do you mind?"

আমি বলিলাম, "Not in the least, চল।"

সিঁড়ি দিয়া বালিকার সঙ্গে আমি তাহাদের রান্নাঘরে নামিয়া গেলাম।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাগি বলিল, "মা, একটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধা আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "কই তিনি?"

আমি ম্যাগির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সস্মিত মুখে প্রবেশ করিলাম। বালিকা পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিল—"ইনি মিষ্টার গুপ্ত। ইনি আমার মা।"

"How do you do?"—বলিয়া আমি করপ্রসারণ করিয়া দিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন। আমার হাত ভাল নয়।" বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন, "আজ শনিবার, তাই কেক্ প্রস্তুত করিতেছি। সন্ধ্যাবেলা লোক আসিয়া ইহা কিনিয়া লইয়া যাইবে, রাত্রে রাজপথে ইহা বিক্রয় হইবে। এইরূপ করিয়া কষ্টে আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি।"

দরিদ্রপল্লীতে শনিবার রাত্রিটা মহোৎসবের ব্যাপার। পথে পথে আলোকময় ঠেলাগাড়ীতে করিয়া অসংখ্য লোক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। রাজপথে এই সন্ধ্যায় ভীড় সকল দিন অপেক্ষা অধিক। শনিবারেই দরিদ্রগণের একটু খরচপত্র করিবার দিন, কারণ সেইদিনই তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইয়া থাকে।

ড্রেসারের* উপর ময়দা, চর্বি, কিসমিস, ডিম্ব প্রভৃতি কেক প্রস্তুতের উপকরণগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। টিনের আধারে সদ্য পক্ক কয়েকটি কেকও রহিয়াছে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "গরীব মানুষের পাকশালায় বসা কি আপনার প্রীতিকর হইবে? আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। ম্যাগি, তুই ইঁহাকে বসিবার ঘরে লইয়া যা। আমি এখনই আসিতেছি।"

আমি বলিলাম, "না না। আমি এখানে বেশ বসিতে পারিব। আপনি বেশ কেক্ তৈয়ারী করিতেছেন ত!"

মিসেস ক্লিফর্ড সস্মিতমুখে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ম্যাগি বলিল, "মা বেশ টফি তৈয়ারি করেন। খাইয়া দেখিবেন?"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। ম্যাগি একটা কবার্ড খুলিয়া একটি টিনের কৌটাপূর্ণ টফি আনিয়া হাজির করিল। আমি কয়েকটি খাইয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলাম।

কেক্ তৈয়ারি করিতে করিতে মিসেস ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ মহাশয়?"

"সুন্দর দেশ।"

"বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি?"

"নিরাপদ বই কি। তবে এদেশের মত ঠাণ্ডা নহে, কিছু গরম দেশ।"

"সেখানে নাকি সর্প ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত অধিক? তাহারা মানুষকে বিনাশ করে না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাহারা লোকালয়ে আসে না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা বিনষ্ট হয়।

"আর জর?"

"জর ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে—সর্বত্র নহে, এবং সব সময়েও নহে।"

*রান্নাঘরের টেবিলের নাম ড্রেসার।—লেখক।

"আমার পুত্র পঞ্জাবে আছে সে সৈনিক-পুরুষ। পঞ্জাব কেমন স্থান মহাশয়?

"পঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জর কম। স্বাস্থ্য খুব ভাল।"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, শুনিয়া সুখী হইলাম।"

তাঁহার কেক্ তৈয়ারী শেষ হইল। কন্যাকে বলিলেন, "ম্যাগি, তুই মিষ্টার গুপ্তকে উপরে লইয়া যা। আমি হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি।"

ম্যাগি অগ্রে অগ্রে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাব-পত্র অতি সামান্য এবং অল্পমূল্য। মেঝের উপর কার্পেটখানি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ছিন্ন, কিন্তু সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ম্যাগি কক্ষে আসিয়া পর্দাগুলি সরাইয়া, জানালাগুলি খুলিয়া দিল। একটি কাঁচে আবৃত পুস্তকের কেস ছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস ক্লিফর্ড চায়ের ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। চা পান করিতে করিতে আমি ভারতবর্ষের গল্প করিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড তাঁহার পুত্রের একখানি ফোটোগ্রাফ দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষ যাত্রার পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ফ্রান্সিস্ অথবা ফ্রাঙ্ক। ম্যাগি একখানি ছবির বই বাহির করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে তাহার দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সিমলা-শৈলের অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি রহিয়াছে। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"To Maggie on her birthday from her loving brother Frank."

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি সেই আংটিটা মিষ্টার গুপ্তকে দেখা না।"

আমি বলিলাম, "তোমার দাদা পাঠাইয়াছেন নাকি? কই ম্যাগি কী রকম আংটি দেখি?"

ম্যাগি বলিল, "সে একটি যাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়। একজন ইয়োগী সেটি ফ্রাঙ্ককে দিয়াছিল।" বলিয়া আংটি বাহির করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইহা হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?"

Crystal gazing নামক একটা ব্যাপারের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম আংটিতে একটি স্ফটিক বসান রহিয়াছে। হাতে করিয়া সেটি দেখিতে লাগিলাম।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক ওটি পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিল, সংযত মনে ঐ স্ফটিকের পানে চাহিয়া দূরবর্ত্তী যে কোনও মানুষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইয়োগী ফ্রাঙ্ককে এই কথা বলিয়াছিল। বহুদিন ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ না পাইয়া, আমি ও ম্যাগি অনেকবার উহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার দেখুন না! আপনি হিন্দু, আপনি সফল হইতে পারেন।"

দেখিলাম কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে। অথচ ইহা যে কিছুই নয়, একটা পিতলের আংটি এবং এক টুকরা সাধারণ কাঁচমাত্র, তাহাও এই জননী ভগিনীকে বলিতে মন সরিল না। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ফ্রাঙ্ক সেই বহুদূর স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি অভিনব অত্যাশ্চার্য্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে, সে বিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া দিই কি প্রকারে?

মিসেস্ ক্লিফর্ড ও ম্যাগির আগ্রহ দর্শনে, অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া স্ফটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলাম। অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "কই, আমি ত কিছু দেখিলাম না।"

মাতা, কন্যা উভয়েই একটু দুঃখিত হইল। বিষয়ান্তরের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিলাম, "ঐ যে একটি বেহালা রহিয়াছে দেখিতেছি, ওটি তোমার বুঝি ম্যাগি?"

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "হাঁ। ম্যাগি বেশ বাজাইতে পারে। একটা কিছু বাজাইয়া শুনাইয়া দে না ম্যাগি।"

ম্যাগি তাহার মাতার প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল— 'Oh mother!'

আমি বলিলাম, "ম্যাগি, একটা বাজাও না। আমি বেহালা শুনিতে বড় ভালবাসি। দেশে আমার একটি বোন আছে, সেও তোমারই মত এত বড় হইবে, সে আমায় বেহালা বাজাইয়া শুনাইত।"

ম্যাগি বলিল, "আমি যেরূপ বাজাই, তাহা মোটেই শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

আমার পীড়াপীড়িতে শেষে ম্যাগি বাজাইতে স্বীকৃত হইল। বলিল, "আমার ভাণ্ডারে অধিক কিছুই নাই। কি শুনিবেন?"

"আমি ফরমাস করিব? আচ্ছা তাহা হইলে তোমার music-case লইয়া এস—

কি কি আছে দেখি।"

ম্যাগি একটি কালো চামড়ায় নির্ম্মিত পুরাতন মিউজিক-কেস বাহির করিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বরলিপিই অকিঞ্চিৎকর, যথা "Goodbye Dolly Grey", "Honeysuckle and the Bee" প্রভৃতি। কয়েকটি রহিয়াছে যাহা যথার্থই ভাল জিনিষ, যদিও ফ্যাসান হিসাবে বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে—যথা। "Annie Laurie", "Robin Adair", "The Last Rose of Summer" ইত্যাদি। দেখিলাম, কয়েকটি স্কচ গানও রহিয়াছে। আমি স্কচ গানের বড়ই পক্ষপাতী। তাই "Blue bells of Scotland" নামক স্বরলিপিটি বাছিয়া আমি ম্যাগির হস্তে দিলাম।

ম্যাগি বেহালায় বাজাইতে লাগিল, আমি মনে মনে সুর করিয়া গানটি গাহিতে লাগিলাম—

"Oh where—and oh where—is my
Highland laddie gone !"

বাজান শেষ হইলে, ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি কখনও উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পায় নাই। যাহা শিখিয়াছে, তাহা নিজের যত্নে শিখিয়াছে মাত্র। যদি কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তবে উহাকে lessons লওয়াইবার বন্দোবস্ত করিব।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বলিলাম, "ম্যাগি, আর কিছু বাজাও না।"

এখন ম্যাগির সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে। বলিল, "কি বাজাইব নির্দ্দেশ করুন।"

আমি তাহার স্বরলিপিগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গান সৌখিন সমাজে আদৃত, তাহার কোনটিই দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, সে সকল গানের প্রতিধ্বনি এখনও এ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করে নাই।

খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটি যথার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বরলিপি হাতে পাইলাম। এটি Gounod কর্ত্তৃক বিরচিত Faust-নামক Opera হইতে Flower-song গান—হাতে তুলিয়া অনুরোধ করিলাম, "এইটি বাজাও।"

ম্যাগি বাজাইল। শেষ হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিলাম। Culture নামক জিনিষটা ইউরোপীয় সমাজের কত নিম্নস্তর অবধি প্রবেশ করিয়াছে ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগি এই কঠিন স্বরলিপিটিও সুন্দর বাজাইল—অথচ

সে একটি নিম্নশ্রেণীর বালিকামাত্র। ভাবিলাম, কলিকাতার কোনও দিগ্‌গজ ব্যারিষ্টার বা প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ানের এই বয়সের কন্যা, গুনোর ফাউষ্ট হইতে একটি সঙ্গীত যদি এমন সুন্দরভাবে বাজাইতে পারিত, তবে সমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত।

ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটিও কি তুমি নিজে শিখিয়াছ ?"

"না। এটি আমি নিজে শিখিতে পারি নাই। আমাদের গির্জ্জার মিনিষ্টারের কন্যার নিকট আমি এটি শিখিয়াছি। আপনি কখনও এ অপেরা শুনিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম, "না। আমি অপেরায় কখনও ফাউষ্ট শুনি নাই। তবে গইটের ফাউষ্টের ইংরাজী অনুবাদ, লাইসীয়মে অভিনয় দেখিয়াছি বটে।"

"লাইসীয়মে ? যেখানে আর্ভিং অভিনয় করেন ?"

"হাঁ। তুমি কখনও আর্ভিং-এর অভিনয় দেখিয়াছ ?"

ম্যাগি দুঃখিতভাবে বলিল, "না, আমি কোন ওয়েষ্ট-এণ্ড থিয়েটারে কখনও যাই নাই। আর্ভিংকে কখনও দেখি নাই। ছবির দোকানের জানালায় তাহার ফোটোগ্রাফ দেখিয়াছি মাত্র।"

"এখন আর্ভিং লাইসীয়মে Merchant of Venice অভিনয় করিতেছেন। মিসেস ক্লিফর্ড আর তুমি যদি একদিন এস, তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাই।"

মিসেস ক্লিফর্ড ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সান্ধ্য-অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, না অপরাহ্নের অভিনয় ?"

এখানে লণ্ডনের থিয়েটার সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। কলিকাতার থিয়েটারের মত, আজ অমুক নাটকের অভিনয়ে "হৈ হৈ শব্দ রৈ রৈ কাণ্ড,"—কাল-নাটকান্তরে "হাসির হর্‌রা, গানের গররা, আমোদের ফোয়ারা" উপস্থিত হয় না। প্রথমতঃ, সেখানে থিয়েটারে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে (রবিবার ছাড়া)। ইহা ব্যতীত কোনও থিয়েটারে শনিবারে, কোনটাতে বা বুধবারে, কোনটাতে বা শনি ও বুধ উভয় বারেই "ম্যাটিনে" অর্থাৎ অপরাহ্ণ-অভিনয়ও হইয়া থাকে। একটি নাটক কোনও থিয়েটারে আরম্ভ হইলে, প্রতিদিন তাহারই অভিনয় হয়। যতদিন অবধি দর্শকের অভাব না ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। এইরূপে কোনও নাটক দুই মাস বা ছয় মাস—বা লোকপ্রিয় Musical comedy হইলে এমন কি দুই তিন বৎসর অবধি অবিচ্ছেদে অভিনীত হইতে থাকে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমার শরীর ভাল নহে। অপরাহ্ণ-অভিনয়ই সুবিধা।

এক শনিবারে, ম্যাগির ছুটির পর একত্র যাওয়া যাইতে পারে।”

আমি বলিলাম, “উত্তম। সোমবার দিন গিয়া, সামনের যে শনিবারের অন্ত পাই, সেই শনিবারের টিকিট কিনিয়া রাখিয়া আপনাকে তারিখ জানাইব।”

ম্যাগি বলিল, “কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, আপনি যেন অধিক মূল্যের টিকিট কিনিবেন না। তাহা যদি কেনেন, তবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব।”

আমি বলিলাম, “না, অধিক মূল্যের টিকিট কিনিব কেন? আপার সার্কেলের টিকিট কিনিব এখন। আমি ত আর একজন ভারতবর্ষীয় রাজা নহি।—ভাল কথা, Merchant of Venice পড়িয়াছ?”

“মূল নাটক পড়ি নাই। স্কুলে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে Lamb's Tales হইতে গল্পাংশ কতকটা উদ্ধৃত ছিল। তাহাই পড়িয়াছি?”

“আচ্ছা, আমি তোমায় মূল নাটক একখানি পাঠাইয়া দিব। বেশ করিয়া পড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে অভিনয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।”

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সোমবার দিন বেলা দশটার সময় লাইসীয়মের বক্স অফিসে গিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আগামী শনিবার অপরাহ্ণ-অভিনয়ের জন্য আমাকে তিনখানা আপার সার্কেলের টিকিট দিতে পারেন?”

কর্ম্মচারী বলিল, “না মহাশয়, এখন সামনের দুই শনিবার দিতে পারি না। সমস্ত আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।”

“তৃতীয় শনিবার?”

“সেদিন দিতে পারি।”—বলিয়া সে ব্যক্তি, সেই তারিখ অঙ্কিত একটি প্লান বাহির করিল। দেখিলাম সে তারিখেও আপার সার্কেলের অনেক আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সেই সেই আসনের নম্বরগুলি নীল পেন্সিল দিয়া কাটা রহিয়াছে।

প্ল্যানখানি, হাতে লইয়া, খালি আসনগুলি হইতে বাছিয়া, পরস্পর সংলগ্ন তিনটি আসন পছন্দ করিয়া, তাহার নম্বর কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলাম। সেই নম্বরযুক্ত তিনখানি টিকিট ক্রয় করিয়া বার শিলিং মূল্য দিয়া চলিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে ম্যাগিকে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে Indisn Bajah নামক হস্তীর পৃষ্ঠে অন্যান্য বালক

বালিকার সহিত ম্যাগিও আরোহণ করিয়াছিল। হাতী চড়িয়া তাহার খুসীর আর সীমা নাই।

এখনও পর্য্যন্ত কিন্তু তাহার ভ্রাতার কোনও সংবাদ আসে না। একদিন মিসেস ক্লিফর্ডের অনুরোধক্রমে ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম, যে রেজিমেণ্টে ফ্রাঙ্ক আছে, তাহা এখন সীমান্ত-সমরে নিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া অবধি মিসেস ক্লিফর্ড চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম, সে লিখিয়াছে প্রিয় মিষ্টার গুপ্ত।

আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহ কাল কর্ম্মস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া একবার আসেন তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব।

ম্যাগি

আমি যে পরিবারে বাস করিতাম, তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বেই ম্যাগি ও তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম।

গৃহিণী আমাকে বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ লইয়া যাইও। মেয়েটি এক সপ্তাহ কর্ম্ম করে নাই, বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।"

প্রাতরাশের পর, আমি কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ল্যাম্বেথ যাত্রা করিলাম। তাহাদের বাড়ীতে পেঁছিয়া দরজায় ঘা দিলাম। ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরাগত। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "Oh, thank you Mr. Gupta. It is so kind—"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন?"

ম্যাগি বলিল, "মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্রাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয় ত তিনি বাঁচিবেন না।"

আমি ম্যাগিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। নিজের রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

আমি বলিলাম, "কি ম্যাগি?"

"বসিবার ঘরে আসুন বলিব।"

পাছে আমাদের পদশব্দে পীড়িতা বৃদ্ধা জাগরিত হন, তাই আমরা সাবধানে বসিবার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দাঁড়াইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ম্যাগি ?"

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল! আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি কিছু না বলিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই ?—ইহার ভ্রাতা সীমান্ত-সমরে, জীবিত কি মৃত তাহা ভগবানই জানেন। পৃথিবীতে এক-মাত্র সম্বল মাতা। সেই মাতা চলিয়া গেলে, ইহার দশা কি হইবে ? এই যৌবনোন্মুখী বালিকা, এই লণ্ডনে দাঁড়াইবে কোথা ?

আমি জোর করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হস্তাবরণ খুলিয়া দিলাম। বলিলাম, "ম্যাগি, কি বলিবে বল। আমার দ্বারা যদি তোমার কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।"

ম্যাগি বলিল, "মিঃ গুপ্ত, আমি যাহা প্রস্তাব করিব, তাহা শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন জানি না। তাহা যদি অত্যন্ত গর্হিত হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"কি ? কি প্রস্তাব ?"

'গতকল্য সারাদিন মা খালি বলিয়াছেন, মিষ্টার গুপ্ত আসিয়া যদি সেই স্ফটিকের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, তবে হয়ত ফ্রাঙ্কের কোন সংবাদ বলিতে পারেন। তিনি ত হিন্দু বটেন।—আমি তাই আপনাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম।"

"তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অঙ্গুরীয় লইয়া এস,—আমি অবশ্যই পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল, কিন্তু এবারও যদি নিষ্ফল হয় ?"

আমি ম্যাগির মনের ভাব বুঝিলাম। বুঝিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ম্যাগি বলিল, "মিষ্টার গুপ্ত, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, হিন্দুজাতি অত্যন্ত সত্য-পরায়ণ। আপনি যদি স্ফটিক অবলোকন করিবার পর মাকে কেবলমাত্র বলেন ফ্রাঙ্ক ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা হইবে ? বড় অন্যায় হইবে ?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল!

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি পুণ্যাত্মা নহি—এ জীবনে আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আজ এই পাপটিও করিব। এইটিই আমার

সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পাপ হইবে।

প্রকাশ্যে বলিলাম, "ম্যাগি তুমি চুপ কর, কাঁদিও না। কই সে অঙ্গুরীয়, দাও একবার ভাল করিয়া দেখি। যদি কিছু দেখিতে না পাই, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। তাহা যদি অন্যায় হয়, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ম্যাগি আমাকে অঙ্গুরীয় আনিয়া দিল। আমি সেটি হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম, "যাও তুমি দেখ তোমার মা জাগিয়াছেন কি না।"

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আসিল। বলিল, "মা জাগিয়াছেন। আপনার আগমন সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছি।"

"আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি?"

"আসুন।"

বৃদ্ধার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া বলিলাম—"মিসেস ক্লিফর্ড, আপনার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা তাঁহার উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, "আপনি স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম, "হাঁ মিসেস ক্লিফর্ড, আমি স্ফটিকেই ইহা দেখিলাম।"

বৃদ্ধার মস্তক আবার উপাধানের সহিত মিলিত হইল। তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "God bless you—God bless you."

মিসেস ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। একবার ইচ্ছা হইল, ল্যাম্বেথে গিয়া ম্যাগি ও তাহার জননীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া আসি। কিন্তু সে পরিবার এখন শোকসন্তপ্ত। সীমান্ত-যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নিহত হইয়াছে। মাসখানেক হইল, কালো বর্ডার দেওয়া চিঠিতে ম্যাগিই এ সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম যে সময় আমি মিসেস ক্লিফর্ডকে বলিয়াছিলাম তাঁহার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে,—তাহার পূর্ব্বেই ফ্রাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল কারণে মিসেস ক্লিফর্ডের নিকট আমার আর মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই আমি একখানি পত্র লিখিয়া, ম্যাগি ও তাঁহার মাতার নিকট বিদায়বার্ত্তা জানাইলাম।

ক্রমে লণ্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি অদ্য দেশযাত্রা করিব। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে বসিয়াছি, এমন সময় বহির্দ্বারে, শব্দ ভাথিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দাসী আসিয়া বলিল, "Please Mr. Gupta, মিস ক্লিফর্ড আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

আমার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নাই। বুঝিলাম ম্যাগি আমার নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। পাছে তাহার কর্ম্মস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, তাই আমি তখনই গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া, টেবিল ছাড়িয়া উঠিলাম। হলে গিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া ম্যাগি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নিকটেই পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল, তাহার মধ্যে ম্যাগিকে লইয়া গিয়া বসাইলাম।

ম্যাগি বলিল, "আপনি আজ চলিলেন?"

"হাঁ ম্যাগি, আজই আমার যাত্রা করিবার দিন।"

"দেশে পৌছিতে আপনার কয়দিন লাগিবে?"

"দুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে।"

"কোন স্থানে আপনি থাকিবেন?"

"আমি পঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি। কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে হইবে, সেখানে না পৌঁছিলে জানা যাইবে না।"

"সেখান হইতে সীমান্ত কি অনেক দূর?"

"না, অধিক দূর নহে।"

"দেরা-গাজীখাঁর নিকট ফোর্স মনরোতে ফ্রাঙ্কের সমাধি আছে।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে ম্যাগির চক্ষু দুইটি ছল ছল করিল।

বলিলাম, "আমি যখন ওদিকে যাইব, তখন অবশ্যই তোমার ভ্রাতার সমাধি দর্শন করিয়া তোমায় পত্র লিখিব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু আপনার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না?"

"কি কষ্ট? কি অসুবিধা? আমি যেখানে থাকিব, সেখান হইতে দেরা-গাজীখাঁ ত অধিক দূর হইবে না। আমি নিশ্চয়ই একবার সুবিধা মত গিয়া, তোমায় পরে সব জানাইব।"

ম্যাগির মুখখানি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাকে ধন্যবাদ দিল,—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। নিজের পকেট হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া, আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, আপনি যখন যাইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া

এক শিলিং দিয়া কিছু ফুল ক্রয় করিয়া, আমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া আসিবেন।”

ভাবের আবেগে আমি চক্ষু নত করিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম বালিকার এই বহু কষ্টার্জ্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই। বলি, আমাদের দেশে ফুল যেখানে সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম। এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে বহু শ্রমলব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য—সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া ফল কি?—এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম।

বলিলাম, ম্যাগি আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া দিব।”

ম্যাগি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, “আমি আর আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? আমার কর্ম্মস্থানে যাইবার বেলা হইল। Good bye:—পত্রাদি যেন পাই।”

আমি উঠিয়া ম্যাগির হস্তখানি নিজহস্তে লইলাম। বলিলাম—“Good bye Maggie—God bless you”;—বলিয়া তাহার হাতখানি স্বীয় ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া তাহাতে একটি চুম্বন করিলাম।

ম্যাগি চলিয়া গেল।

চক্ষের দুই ফোঁটা জল রুমালে মুছিয়া, বাক্স-তোরঙ্গ গোছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম।

[ভাদ্র, ১৩১১]

রসময়ীর রসিকতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রমোহনবাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর সহিত দ্বন্দ্ববিগ্রহ ও সন্ধি করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিণী স্ত্রী [illegible]

ক্ষেত্রমোহনের বয়স এখন চল্লিশ বৎসর। স্ত্রী রসময়ীর বয়স ত্রিশ। 'রসময়ী'! —এ নাম যে রাখিয়াছিল বলিহারি তাহার প্রতিভা! তবে রসও অনেকগুলি আছে কিনা—এ ক্ষেত্রে রৌদ্ররস।

ক্ষেত্রমোহন একজন বাঙ্গলানবীস মোক্তার; হুগলীতে থাকিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করেন। বাড়ী তাঁহার হুগলীতে নহে—জেলার মধ্যে কোন এক পল্লীগ্রামে। তবে কয়েক বৎসর হইল হুগলীতে নিজ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমোহনের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই—স্ত্রীর যেরূপ বয়স আর হইবার ভরসাও নাই। অনেকদিন হইতে তাঁহার মাসী পিসী প্রভৃতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনের আন্তরিক বাসনাও তাহাই। কিন্তু রসময়ীর ভয়ে এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টাচরিত্র করিতে সাহস করেন নাই।

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে রসময়ী ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া ক্ষেত্রমোহনকে দুইদিন গৃহছাড়া করিল। অবশেষে নিজে তাহার পিত্রালয় হালিসহরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন সাহসে ভর করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন রসময়ীর আর মুখদর্শন করিবেন না—অন্যত্র বিবাহ করিবেন। এ বাড়ীতে রসময়ীকে আর ঢুকিতে দিবেন না—এই শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হালিসহর গ্রামটি হুগলীরই অপর পারে—মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিত্রালয়। অনেকদিন হইল তাহার পিতামাতার কাল হইয়াছে। এখন সে বাড়ীতে রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় কর্ম্ম করে; সুবোধ ইস্কুল ছাড়িয়া এখন বাড়ীতেই বসিয়া আছে—এখনও কিছু জুটে নাই।

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিসহরে বাস করিতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ স্থলে দুইচারি দিন বা বড় জোর এক সপ্তাহ পরে, দন্তে তৃণ করিয়া ক্ষেত্রমোহন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কত সাধাসাধনা করিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রসময়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

পাড়ার একজন বালক প্রত্যহ নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া হুগলি ব্রাঞ্চ ইস্কুলে পড়িতে যাইত। সে ছেলেটি গ্রামে প্রচার করিয়া দিল—ক্ষেত্রমোহনবাবুর বিবাহ; দিনস্থির হইয়া গিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রসময়ীর দিদি বিনোদিনী একদিন বৈকালে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাকে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন—"বাবা শুনলাম নাকি আমাদের ক্ষেত্তর আবার বিয়ে করছে? এ কথা কি সত্যি?"

বালক বলিল—"হাঁ সত্যি বইকি। আমাদের ক্লাশে সুরেশ বলে একটি ছেলে পড়ে, চুঁচড়োয় তার মামার বাড়ী। তারই মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে।"

"ঠিক জান?"

"জানি বইকি। সুরেশই ত আমাকে বলেছে। দিনস্থির পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।"

"তার মামার নাম কি?"

"নাম হরিশচন্দ্র চাটুয্যে। জজ আদালতে কর্ম্ম করেন।"

"তাদের বাড়ীটি তুমি চেন বাবা?"

"হ্যাঁ চিনি বইকি। সুরেশের সঙ্গে কতবার গিয়েছি।"

"কত বড় মেয়ে?"

"এই আমাদের বয়সীই হবে।"—বালকটির বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।

"কেমন দেখ্‌তে?"

"তা—বেশ সুন্দর।"

বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা, কাল একবার আমাদের দু-বোনকে সে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পার বাবা?"

"কেন?"

"তাদের একবার মিনতি করে বলে কয়ে দেখি। বিয়ে হলে আমার বোনটিরও সুখ হবে না—তার মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে চল।"

"কখন?"

"এই—খাওয়া দাওয়ার পরে।"

"আমার ইস্কুল কামাই হবে যে?"

"একদিনের জন্যে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিও এখন। আমি বরং তোমায় একটি টাকা দেব—ঘুড়ি, লাটাই এ সব কিনো।"

বালকটি ব্যগ্রভাবে নিজ সম্মতি জানাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এগারোটার সময় দুই ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বালকটি চুঁচুড়া যাত্রা করিল। গঙ্গাপার হইয়া, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া মাধবীতলায় হরিশবাবুর গৃহে

গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কী দরজার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল।

রসময়ী বলিল—“এই বাড়ী ?”

“হঁ্যা।”

“আচ্ছা, তুমি গাড়ীর ভিতর বসে থাক। আমরা চট্ করে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।”—বলিয়া দুইজনেই অবতরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বাড়ীর মেয়েরা কেহ তখন স্নান করিতেছে, কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ বা আহারান্তে উঠানে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রঘরের অপরিচিতা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে বলিল—“তোমরা কারা গা ?”

বিনোদিনী বলিল, “আমরা হালিসহর থেকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।”

স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধভাবে বলিল—“এস—বস”।

দুইজনে বারান্দায় উঠিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—“বাড়ীর গিন্নী কোন্‌টি ?”

একজন প্রৌঢ়াকে দেখাইয়া সকলে বলিল—“ইনি গিন্নী।”

গৃহিণী বলিলেন—“তোমরা কি মনে করে এসেছ বাছা ?”

বিনোদিনী বলিল—“তোমাদের মেয়ের নাকি বিয়ে ?”

গৃহিণী বলিলেন—“হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির বিয়ে।”

“কবে ?”

“এই বিশে মাঘ দিন স্থির হয়েছে।”

“পাত্রটি কে ?”

“ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী—হুগলীতে মোক্তারি করেন।”

“সতীনের উপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা ?”

গৃহিণীর বিস্ময় প্রতি কথায় বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা চেন নাকি ?”

বিনোদিনী বলিল—“চিনিনে আবার—খুব চিনি। আমাদের গ্রামেই ত বিয়ে করেছে।”

গৃহিণী বলিলেন—“হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে।”

রসময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল; তাহার মনের রাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—“কেন পরিত্যাগ করেছে কিছু শুনেছ গা ?”

"শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দজ্জাল।"

শ্রবণমাত্র রসময়ী তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারান্দার কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিণীর উপর সপাসপ্ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কেন?—কেন?—আর কি মরবার জায়গা পেলে না?—জায়গা পেলে না?—আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্ত পাত্তর জুটলো না? জুটলো না?"

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ীর লোকে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার পর মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অল্পবয়স্কা বালিকারা কাঁদিয়া ছুটিয়া কেহ খাটের নীচে, কেহ সিন্দুকের আড়ালে লুকাইল। বাড়ীর ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, সে বাসন ফেলিয়া—"ওরে খুন কল্লে রে—খুন কল্লে রে—সেপাই—এ সেপাই—এ পাহারাওয়ালা"—বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীর অপর মেয়েরা আসিয়া রসময়ীকে ধরিয়া ফেলিল। রসময়ী তখন গৃহিণীকে ছাড়িয়া তাহাদের উপর কিল চড় ও নিষ্ঠীবন-বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া দিল, কাহারও চুল ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও খামচাইয়া দিল, কাহাকেও কামড়াইয়া দিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল—"কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের কর না। চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই। নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিয়ে যাই।"

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে সদর দরজায় লোক হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল, "রসময়ী থাম্ থাম্—ক্ষ্যামা দে বোন্—খুব হয়েছে চল্ বাড়ী চল্।

ঝি ছুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ওগো যেতে দিওনি—থানায় খবর দিয়ে এসেছি, দারোগা আসছে।"

পুলিসের নাম শুনিয়া রসময়ী বলিল—"চল্ দিদি, চল্।"

"যাবে কোথা—দারোগা আসুক তবে যেও।"—বলিয়া দুই তিনটি স্ত্রীলোক রসময়ীকে ধরিতে অগ্রসর হইল।

রসময়ী এক লম্ফে উঠানের কোণ হইতে আঁশবঁটিখানা সংগ্রহ করিয়া মাথায় উপর সবেগে ঘুরাইয়া বলিল—"খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে—সবাইকে খুন করে ফাঁসি যাব।"

ইহা দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক "মা গো:" বলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। "পাহারাওয়ালা—এ পাহারাওয়ালা—আসামী পালায়"—বলিয়া চীৎকার

করিতে করিতে ঝি পুনশ্চ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

রসময়ী তখন দিদির সহিত খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—"পারঘাটে চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য হরিশ্চন্দ্রবাবু ক্ষেত্রমোহনকে কন্যাদান করিলেন না তাঁহার গৃহিণী বলিলেন—"সে খুনে মেয়েমানুষ, বিয়ে দিলে আমার মেয়েকে খুন করে ফেলবে। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"

পরদিন কাছারীতে গিয়া হরিশবাবুর মুখে ক্ষেত্রমোহন সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

কাছারি হইতে বাড়ী ফিরিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্বাক হইয়া ক্ষেত্রমোহনের পানে দৃষ্টিপাত করিল—সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিপাতে পূর্ব্বে মুনিঋষিরা লোককে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কি মনে করে?"

রসময়ী অসম্ভব সংযমের সহিত উত্তর করিল—"একটা শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে।" তাহার ওষ্ঠযুগল ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহনবাবু বলিলেন—"শ্রাদ্ধটা কার?"

"হরিশ চাটুয্যের মেয়ের—আর মেয়ের মার।"

"তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না?"

"সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ নাকি শুনলাম?"

হুঁকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিতভাবে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"করছিই ত। করব না কেন? তোমার ভয়ে নাকি?"

রসময়ী চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—"কর না, করে একবার মজাটাই দেখ না।"

"কি করবে তুমি?"

"এই এমন কিছু না। আঁশবঁটি দিয়ে সে মেয়ের নাকটা কেটে দেব—আর বুকে একখানা দশমুণে পাথর চাপিয়ে দেব।"

"আর তোমার নাকটা কাণটা কেউ যদি কেটে দেয়?"

"এস না। কাট না। তুমিই কাট না হয়।"—বলিয়া রসময়ী নিজ কোমরে

দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া, নিজের মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়া দিল।

স্ত্রীর এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন আবার হুঁকা উঠাইয়া লইয়া আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া থাকিয়া যখন ক্লান্তি বোধ হইল, রসময়ী তখন নিজের মুখ সরাইয়া লইয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—"তা হলে আঁশবঁটিতে শাণ দিয়ে রাখিগে? সম্বন্ধ পাকা হলে খবরটা দিও—চুপি চুপি যেন শুভকর্ম্মটা সেরে ফেল না।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে?"

এই কথা শুনিয়া রসময়ী বিদ্রূপের স্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"আমি মরব কবে জিজ্ঞাসা করছ? রসি বামনি এখনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করার বয়স যাবে—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে—ভুঁয়ে মুয়ে এক হয়ে যাবে—যখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজি হবে না—তখন আমি মরব।"

দাম্পত্য রসালাপ এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে বাহিরে একখানি গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। রসময়ী বলিল—"তবে সেই কথাই রইল। এখন তবে আসি। দিদি ওপাড়ায় তার জায়ের বাড়ী গিয়েছিল—ভাবলাম তার সঙ্গে এসে তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কয়ে যাই।" বলিয়া রসময়ী প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত কথোপকথনের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। রসময়ীর গর্ব্ব সফল হইল না। সে এখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত।

সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রমোহনবাবু হালিসহরে গেলেন। চিকিৎসাদির কিছুই ত্রুটি হইল না। কিন্তু রসময়ী বাঁচিল না।

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর মুখাগ্নি করিলেন। আশ্চর্য্য সংসারের মায়া—যে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহার জন্তও ক্ষেত্রমোহন ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

আরও মাস ছয় কাটিল। ক্ষেত্রমোহনের পার্শ্বচর বন্ধুবান্ধবগণ নানা স্থানে পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে হুগলীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে সুযোগ্য পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং গিয়া দেখিয়া আসিলেন। মেয়েটি ডাগর—দেখিতেও ভাল। বিশেষ মেয়ের পিতা একটি বড় জমিদারের নায়েব—ওদিককার মামলা মোকর্দ্দমাগুলিও এই সূত্রে ক্ষেত্রমোহনবাবুর করায়ত্ত হইবে! কন্যার পিতা

রজনীকান্ত ঘোষাল ইংরাজী লেখাপড়া জানা ব্যক্তি।

বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইল। বরের খুড়া মহাশয় গ্রাম হইতে আসিয়াছেন—কল্য আশীর্ব্বাদ। প্রভাতে আফিসকক্ষে বসিয়া দুই চারিজন মক্কেলের সঙ্গে মোক্তারবাবু কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—খুড়া মহাশয় একখানি "বঙ্গবাসী" হস্তে ঘরের কোণে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় ডাকপিয়ন আসিল, ক্ষেত্রমোহনবাবুর হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল।

খামের উপর হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষেত্রমোহনের মাথা ঘুরিয়া গেল। দুই চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া বারম্বার খামখানির শিরোনামা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাছে আনিয়া দূরে সরাইয়া, নানা প্রকারে দেখিলেন।

অবশেষে কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন। পড়িয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মক্কেলগণকে বলিলেন—"আচ্ছা, এখন তোমরা যাও—আজ সকালে সকালেই কাছারি যাব—সেইখানেই বাকি কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

মক্কেলগণ চলিয়া গেলে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"চিঠি এল ক্ষেত্তর?"

জড়িত স্বরে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"আজ্ঞে হঁ্যা।"

"কোথাকার চিঠি?"

"তাই ত ভাবছি।"

ক্ষেত্রমোহনের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া খুড়া মহাশয় উঠিয়া নিকটে আসিলেন। তখন ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেছেন। তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

খুড়া মহাশয় দ্রুতভাবে বলিলেন—"কি? ব্যাপার কি? কোনও দুঃসংবাদ নয় ত?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু নীরবে পত্রখানি খুড়া মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি পত্র লইয়া চশমা অনুসন্ধান করিয়া চক্ষে পরিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া খুড়া মহাশয় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। সাধারণ পাতলা চিঠির কাগজে, বেগুনী রংয়ের ম্যাজেণ্টা কালি দিয়া লেখা—উপরে স্থানের নাম নাই, তারিখ নাই—নিম্ন প্রকারে লিখিত:

শ্রীশ্রী দুর্গা

স্বহায়

প্রণামপূর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস—

তোমার মোতিশ্চন্ন ধরিআছে। মোনে করিআছ রসমই মরিআছে আপোর

গিআছে এইবার বিবাহ করি। আমি মরিআছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিস্চিতি পাইআছ তাহা মোনেও করিও না। বাড়ির সনমুখে যে বড় বটগাচ আছে তাইতে আমি আজকাল বাস করিতেছি। তুমি কি কর কোতায় যাও সমস্থই আমি সেখানে বসিয়া দেখিতেছি। রাত্তিরে গাচ হইতে নামিয়া মাজে মাজে তোমার সয়ন ঘরে যাই। তোমার খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই। এক একবার ইচ্ছা করে গলাটা টিপিয়া দিয়া তোমাকেও আমার সঙ্গি করি। আমার একানে বডডো একলা বোধ হয়। আমার চেহারা একন ওতিশয় খারাপ হইয়া গিআছে। আমার গাএর মাংসো চামড়া আর কিছুই নাই। খালি হাড় আছে তাও সাদা নয়। গংগাত্তিরে আমাকে জে পোড়াইআছিলে তাইতে হাড়গুনো কালো কালো হইয়া গিআছে। যাহা হউক নিজের রূপ বন্ননা নিজের মুখে শোভা পায় না। বিবাহ করিও না করিলে তোমার নলাটে অসেস দুগগতি নেকা আছে।

রসময়ি

পত্র পড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার চিনতে পারছ?"

"খুব চিনি। তারই হাতের লেখা।"

"অন্য কেউ জাল করেনি ত?"

"ভগবান জানেন।"

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ছাদের কড়িকাঠের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জয়রাম—সীতারাম—রাম-রাঘব রাবণারি—রাম—রাম—রাম।"

খুড়া মহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহনের আরও ভয় হইল। বলিলেন—"আচ্ছা খুড়ো মশায়—ভূতে কখন চিঠি লেখে?"

খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"ভূত বলতে নেই—ভূত বলতে নেই—উপদেবতা বল। জয় রাঘব রামচন্দ্র।"

দুইজনেই নির্ব্বাক। অবশেষে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"দেখ—কারুর বদমাইসি নয় ত? এমনটাই কি হতে পারে? অনেক রকম ভৌতিক উপদ্রবের কথা শুনেছি বটে—কিন্তু—এরকমটা—কখনও ত শোনা যায়নি। আচ্ছা,—বউমার হাতের লেখা আগেকার চিঠিপত্র কিছু আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"পুরাণো চিঠি আছে বই কি।"—বলিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি পাঁচখানা বাহির করিয়া আনিলেন।

খুড়া মহাশয় চশমার কাঁচ দুইখানি কোঁচার কাপড়ে ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিয়া লইলেন। পরে পত্রগুলি লইয়া অত্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"একই হাতের লেখা ত দেখছি।" খামখানা উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক পয়সার ছয়খানা ওয়ালা শাদা খাম। তাহাতে একখানি দুই পয়সার টিকিট আঁটা আছে। ক্ষেত্রমোহনের হাতে খামখানি দিয়া বলিলেন—"কোথাকার ছাপ দেখ ত?"

ক্ষেত্রবাবু বাঙ্গালানবীশ মোক্তার হইলেও ইংরাজি ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিতেন। ছাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"হুগলির ছাপ। কালকের তারিখ।"

খুড়া মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কেবল অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"জয় রাম—শ্রীরাম—সীতারাম।"

কাছারির বেলা হয় দেখিয়া মোক্তারবাবু স্নান করিয়া আহারে বসিলেন—কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। রান্নাঘরের বারান্দায় যেখানে বসিয়া তিনি আহার করিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাছটার অগ্রভাগ দেখা যায়। খান, আর মাঝে মাঝে সেই গাছটার পানে চাহেন। একসময় গাছের একটা ডাল খড় খড় করিয়া নড়িয়া উঠিল। কাহার যেন হাসিরও শব্দ শুনা গেল। ক্ষেত্রমোহনবাবুর আর খাওয়া হইল না। উঠিয়া পড়িলেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া বটগাছটার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। দুই তিনটা কাঠবিড়ালী ডালে ডালে পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। গোটাকতক কাক উচ্চ-শাখায় বসিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেত্রমোহনের শয়নকক্ষে খুড়া-ভাইপো বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দিবসে খুড়া মহাশয় কপাটের বাহিরে এবং ভিতরে দেয়ালময় রামনাম লিখিয়া দিয়াছেন। অদ্য দুইজনেই এক শয্যায় শয়ন করিবেন। বালিসের তলায় একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ রক্ষিত হইবে এবং ঘরে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিবে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তা হবে খুড়ো মহাশয়, কি করা যায়? বিবাহটা বন্ধই করে দেওয়া যাবে?"

খুড়া মহাশয় বলিলেন—"আমি ত তার দরকার দেখছিনে।"

"যদি কোনও উপদ্রব অত্যাচার হয়?"

খুড়া মহাশয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"ভয়ের কোনও কারণ দেখিনে।"

"ঐ যে বলেছে ইচ্ছা করে তোমার গলাটা টিপে দিই ?"

"নাঃ—তা পারবে না। হাজার হোক স্বামী ত বটে।"

"আর যে বলেছে বিয়ে কোরো না, করলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে ?"

"অশেষ দুর্গতি হবে, তার মানে এ নাও হতে পারে যে আমি তোমার অশেষ দুর্গতি করব। ওর মানে বোধ হয় এই যে, অধিক বয়সে বিবাহ করলে যে সমস্ত সাংসারিক অশান্তি উপস্থিত হয়, তাই তোমারও অদৃষ্টে ঘটবে।"

ক্ষেত্রমোহনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মনে ভয়ও যথেষ্ট আছে—অথচ বিবাহ করিবার লোভটিও সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।

পরদিন আশীর্বাদ হইয়া গেল ; কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে ভৌতিক পত্র পাইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। নায়েব রজনীবাবুর কাণে ক্রমে এ কথা পৌঁছিল। বলিয়াছি তিনি ইংরাজি জানা ব্যক্তি,—শুনিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ভূত! এই বিংশ শতাব্দীতে ভূত বিশ্বাস করতে হবে ?"

বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে ৮ই ফাল্গুন। আর পাঁচদিন মাত্র বাকী আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়োজনাদি হইতেছে। বিকালে বৈঠকখানায় ক্ষেত্রবাবু জনকয়েক বন্ধুবান্ধব সহ বসিয়া ছিলেন।—ইঁহাদের মধ্যে একজন সরকারী উকিল—নাম মনোহরবাবু। লোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। চোখে সোণার চশমা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—মুখমণ্ডল প্রচুর গোঁফদাড়িতে আবৃত—হাতে বড় বড় নখ—এক কথায়,—লোকটি থিয়জফিস্ট। ক্ষেত্রবাবুর ভৌতিক পত্রপ্রাপ্তির সমাচার অবগত হইয়া অবধি, মনোহরবাবু ইঁহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। —অপর একজন নব্য-যুবক—নাম সুরেন্দ্রনাথ। ইনি এল-এ ফেল করা শিক্ষিত মোক্তার। বিস্তর ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ক্ষেত্রবাবু একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। অনেক অনেক উপন্যাসে পড়া গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেমন রেলে কলিশন বা নৌকাডুবি বা আর কিছু সকলেই মনে করছে অমুক লোকটা মরে গেছে, মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষীরও অভাব নেই,—কিন্তু বইয়ের শেষ দিকটায় দেখা গেল সে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি জাল। কিন্তু আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি তাঁরই হাতের লেখা—জাল নয়। সুতরাং আপনার বেঁচে আছেন বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায়ন্তর নেই। কারণ, এ বিংশ শতাব্দীতে

ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

থিয়জফিষ্ট উকিলবাবুটি ইহা শুনিয়া বলিলেন—"কেন মশাই—বিংশ শতাব্দীতে ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারেন না কেন?"—

নবীন মোক্তারবাবু বলিলেন—"কারণ আমি কখনও দেখিনি।"

শুনিয়া মনোহরবাবু বিজ্ঞভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন—"সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন?"

"না, দেখিনি।"

"তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করেন?"

"করি। তার কারণ, আমি না দেখলেও, হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখেছে। তাঁর দশ বিশখানা ছবিও দেখেছি। কিন্তু 'ভূত আমি নিজে দেখেছি' এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সবাই বলে, খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছে যে তারা স্বয়ং ভূত দেখেছে।"

মনোহরবাবু তাঁহার সুঘন দাড়ির মধ্যে দীর্ঘনখ অঙ্গুলিগুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন—"আপনি বললেন, হাজার হাজার লোক সম্রাটকে দেখেছে। তেমনি হাজার হাজার লোক অশরীরী আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করেছে। আপনি বললেন যে সম্রাটের দশবিশখানা ছবি দেখেছেন। তেমনি দশবিশখানা ভূতেরও ছবি আপনাকে আমি দেখাতে পারি। যদি দেখতে চান, একদিন আমার বাড়ীতে যাবেন। আমার একখানা বইয়ে কেটি কিং-এর ছবি আছে। প্রথম চার্লসের সময় কেটি কিং নামে একটি মেয়ে জীবিত ছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থানে অনেক সেয়াঁসে, কেটি কিং স্থূলশরীর ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করা হয়েছে, তাঁর শরীরে ছুরি ফুটিয়ে দিয়ে দেখা হয়েছে ঠিক মানুষের মত রক্তপাত হয়, তাঁর ফোটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তোলা হয়েছে; ফোটোগ্রাফ থেকে তৈরি ছবি আমার বইয়ে আছে—আসবেন, দেখাব।"

সুরেন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনারাও যেমন ভালমানুষ! ঐ সব বিশ্বাস করেন? ভূতবাদীদের কত জোচ্চুরি ধরা পড়েছে তার সংখ্যা নেই। কেটি কিং-এর দেহে ছুরি ফুটিয়ে রক্তপাত হয়েছে ঐটে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ বলে উল্লেখ করলেন। আমার ত ঠিক উল্টো মনে হয়। ছুরি ফোটালে রক্ত না পড়ত—অথচ শরীরী মানুষ একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছি—তা হলে বরং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয়। এ ক্ষেত্রে দেখুন, ভূত, তিনি বাড়ীর সামনেই বটগাছে

থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পারেন, এখন অনায়াসেই মূর্ত্তিগ্রহণ করে নিজের বক্তব্য বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা না করে খাম, কাগজ, কালি, কলম সংগ্রহ করবার কষ্ট স্বীকার করলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু—চিঠিখানি টেবিলের উপর রেখে গেলেই হত, তা না করে এক মাইল দূরে পোষ্ট আপিসে গেলেন তাকে পোষ্ট করতে। আবার দুটো পয়সা খরচ করে টিকিট কিনতে হল। মশায়, ভৌতিক জগতে পয়সা যদি বা শুবিকই এত সস্তা হয়, তা হলে না হয় সেইখানে গিয়েই প্র্যাকটিস সুরু করি।"

মনোহরবাবু একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"মশায়, জিনিসটা হাসি তামাসার নয়। এসব গভীর বিষয়। অনেক চর্চ্চা, আলোচনা না করে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। ভৌতিক জগৎ থেকে ডাকে চিঠি আসা এই প্রথম নয়। হিমালয় থেকে মহাত্মারাও মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। কুটুম্বিলাল নামক এক মহাত্মা এ রকম অনেক চিঠি আমাদের মাদাম ব্লাভাটস্কিকে লিখেছিলেন। তাঁরাও মনে করলে সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়ে বক্তব্য বলে যেতে পারতেন কিম্বা চিঠি উড়িয়ে টেবিলের উপর ফেলে যেতে পারতেন—কিন্তু ডাকেই তাঁরা চিঠিপত্র পাঠাতেন।"

ইহা শুনিয়া শিক্ষিত মোক্তারবাবু মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কুটুম্বিলালের চিঠি ত কোন্ কালে জাল বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ডাক্তার হজ্‌সন বলে একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভারতবর্ষে এসে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মাদাম ব্লাভাটস্কি আর দামোদর বলে এক ব্যক্তি সব চিঠি জাল করেছিলেন।"

একথা শুনিয়া থিয়জফিষ্টবাবুটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"ও সব ঈর্ষ্যাপরায়ণ লেখকের বই পড়বেন না। আমার কাছে আসবেন, ভাল ভাল বই সব আপনাকে পড়তে দেব। তা পড়লে আপনার সমস্ত অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে। মাদাম ব্লাভাটস্কি যে কতবড় লোক তা তাঁর 'আইসিস্ আন্‌ভেল্ড' বইটে পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

সুরেন্দ্রবাবু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—সে বইটে পড়িনি বটে, তবে এড্‌মণ্ড গ্যারেট প্রণীত 'আইসিস ভেরি মচ্ আনভেল্ড—অর দি ষ্টোরি অব্ দি গ্রেট মাহাৎমা হোক্স' বইটে পড়েছি। লাইব্রেরিতে আছে। দেখতে চান ত এনে দিতে পারি।"

এ কথায় মনোহরবাবু রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঐ আপনারা এক কথা শিখে রেখেছেন! গাল দেওয়া যায় না এমন ভাল জিনিষই নেই। যত সব কুচক্রী বদমায়েস লোক মিছামিছি মাদামের অপবাদ রটনা করেছে।"

এমন সময় বাহিরে শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু চিঠি আছে।" পরমুহূর্ত্তে ডাকপিয়ন প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রবাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি হাতে লইয়াই ক্ষেত্রমোহনবাবুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বলিলেন—"মশাই—আবার সেই।"

পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সেখানি সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। থিয়জফিষ্ট-বাবুটি অতি আগ্রহের সহিত সেখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। শেষে নবীন মোক্তারবাবুর হাতে সেখানি দিলেন।

পত্রখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রী দুর্গা

সহায়

প্রণাম পূর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেশ

এত সাহস তোমার। আসিব্বাদ পত্তর হইয়া গিআছে। তুমি মোনে করিআছ আমি তোমায় জে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাকা আওআজ। রসি বামনি তেমন মেয়ে নয়। আমি মানা করা সত্তেও বিবাহ করিবে। একনও সাবধান হও। এ দুরমোতি পরিত্যাগ কর। নহিলে একদিন গভির রাত্তিরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাচ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখান দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাগিবে না।

রসময়ি

একে একে সকলে পত্রখানি পড়িলেন। পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। শিক্ষিত মোক্তারবাবুরও মুখ শুকাইয়া গেল। তথাপি তিনি মন হইতে সংশয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু—আর একবার বেশ করে লেখাটা পরীক্ষা করে দেখুন দেখি। আপনার স্ত্রীর হাতের লেখাই বটে ত? না কোন জায়গায় কোন সন্দেহজনক তফাৎ আছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কোন সন্দেহ নেই। শুধু হাতের লেখার মিল হলেও বা সন্দেহ করতাম। তার যেখানে যেখানে যে যে বানান ভুল চিরকাল হত, এ চিঠিতেও তাই। সে চিরকালই শ্রীশ্রী এক জায়গায়, দুর্গা একটু তফাতে লিখত—এ দুখানা চিঠিতেও তাই। তা ছাড়া, চিঠিতে এমন সব কথাবার্ত্তা রয়েছে যা সে জীবিত কালেও মুখে সর্ব্বদা ব্যবহার করত।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎপরে সুরেন্দ্রবাবু গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁর মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"ছিলাম বইকি।"

"সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে গিয়েছিলেন ?"

"গিয়েছিলাম।"

"চিতার উপর তাঁর দেহ রাখবার পর তাঁর মুখ আপনি আর দেখেছিলেন ?"

"দেখিনি আবার ? আমি নিজেই ত মুখাগ্নি করেছি। ওহে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও ভুল হয়নি।"

নব্য মোক্তারামবাবু তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বলিল—

'There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy"

(হে হোরেশিও—স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার বিষয় তোমা'র দর্শনবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে)।

অপর একজন বলিলেন—"তা ত বটেই, তা ত বটেই ধরুন আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশই বা বলি কেন—সকল দেশেই, আদিকাল থেকে যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ভূত বলে একটা জিনিষ আছে তার কি কিছুই ভিত্তি নেই ?"

সরকারী উকিলবাবুটি বলিলেন—"শুধু অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভূতের অস্তিত্ব নিঃসংশয়য়িতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। এক সময় বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ টিণ্ডাল পর্য্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। বিখ্যাত সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন,—'of all the vulgar superstitions of the half educated, none dies harder than the absurd delusion that there are no such things as ghosts. (অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে যতগুলি ইতরজনোচিত কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যে 'ভূত নাই' এই অদ্ভুত ভ্রমটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল)"—বলিয়া বিজয়ী বীরের মত তিনি সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল। সেই বটগাছের তলা দিয়া যাইতে সুরেন্দ্রবাবুরও গা-টা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"দেখ ক্ষেত্তর—ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। বিবাহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক্। আমার মতে, বৎসর পূর্ণ হলেই,

গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে এস, উদ্ধার হয়ে যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশী দেরী নেই—আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম শেষ করা যাবে।”

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—“তা বেশ—সেই ভাল কথা।”

কন্যার পিতাকে বলিয়া কহিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাহৃত হইল। গয়া-শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া ক্ষেত্রবাবু বিবাহ করিবেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

ক্ষেত্রবাবুর হস্তে একটা বড় জালিয়াতির মোকর্দ্দমার তদ্বিরের ভার রহিয়াছে। মোকর্দ্দমাটা দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়াছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্রবাবু গয়া যাইতে পারিতেছেন না। ফরিয়াদি পক্ষে সাক্ষীদিগকে সমস্ত দিন ধরিয়া তালিম দিতে হইতেছে।

মোকর্দ্দমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারি হইতে ফিরিবার সময় “রসময়ী”র তৃতীয় পত্র ক্ষেত্রবাবুর হস্তগত হইল। তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা আছে—

“সুনিলাম না কি গয়ায় আমার পিণ্ডি দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উদ্ধার হইয়া যাইব তকন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।”

ক্ষেত্রবাবুর আর বাড়ী যাওয়া হইল না। কাছারির পোষাকেই মনোহরবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন।

মনোহরবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন—“এ যে বড়ই বিপদ দেখছি। বিবাহ করবার কল্পনা আপনাকে পরিত্যাগ করতে হল।”

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—“আচ্ছা মশায়, অশরীরী আত্মা মানুষের বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পারে? আপনাদের থিয়জফি শাস্ত্রে কি বলে?”

মনোহরবাবু একখানি মোটা বহি আলমারি হইতে পাড়িয়া একস্থান খুলিয়া বলিলেন—“এ সম্বন্ধে থিয়জফি শাস্ত্রের মত এই। মুক্তাত্মাগণ সাধারণতঃ অশরীরী। কিন্তু কখন কখন তাঁরা নিজেকে মেটিরিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহসম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে বায়ু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে,—এমন কি কাছাকাছি মানুষের দেহ থেকে, আবশ্যক পদার্থগুলি সংগ্রহ করে নিজ দেহ ধারণ করেন। সুতরাং সে অবস্থায় বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আর এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধরে চিঠি লিখতে সক্ষম সে হস্ত ছুরী ধরতে পারবে না কেন?”

ক্ষেত্রমোহনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখুন, এ পত্রগুলো জাল কি না সেটা একবার ভাল করে তদন্ত করতে হচ্চে। আমি বলি কি, এই যে কলকাতা থেকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক আমাদের দায়রার মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে আসছেন, তাঁকে দিয়ে এ চিঠিগুলো একবার পরীক্ষা করালে হয় না?"

থিয়জফিস্ট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনের এ সন্দেহবাদে মনে মনে বিরক্ত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করাতে পারেন।"

পরদিন দায়রায় জালের মোকদ্দমাটির বিচার আরম্ভ হইল। হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক সফ্‌টমোর-সাহেব সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। দিন-শেষে কাছারির পর, ক্ষেত্রমোহন ডাক-বাঙ্গলায় গিয়া সফ্‌টমোর সাহেবকে ভৌতিক পত্র তিনখানি দিলেন। তুলনার জন্য রসময়ীর কয়েকখানি পুরাতন আসল পত্রও দিয়া আসিলেন। সাহেব বলিলেন—"কল্য প্রাতে পরীক্ষার ফলাফল জানাইব।"

পরদিন প্রাতঃকালে সরকারী উকীল মনোহরবাবুকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রমোহন আবার ডাক-বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন—"পরীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তের লেখা।"

ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। মনোহরবাবু বলিলেন—"সাহেব, অনুগ্রহ করিয়া একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে পারেন?"

সাহেব মনে করিলেন—নিশ্চয়ই এ পত্র লইয়া একটা মামলা মোকদ্দমা হইবে। আবার সাক্ষী দিতে আসিয়া ফী পাওয়া যাইবে।—সুতরাং আহ্লাদের সহিত তিনি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

বাসায় যাইতে যাইতে মনোহরবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—"এই চিঠিগুলির নকল আর সাহেবের সার্টিফিকেট যদি আমাদের থিয়জফিক্যাল রিভিউ নামক মাসিক-পত্রে ছাপাতে পাঠাই তাতে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?—আমরা যাকে স্পিরিট-রাইটিং বলি তার সুন্দর অকাট্য প্রমাণ হবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তাতে আমার আপত্তি নেই।"

পরবর্ত্তী সংখ্যা থিয়জফিক্যাল রিভিউ পত্রে সার্টিফিকেট সহ চিঠিগুলি ছাপা হইয়া গেল। নানা স্থান হইতে বড় বড় থিয়জফিষ্টগণ ক্ষেত্রমোহনবাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ হুগলীতে আসিয়া পত্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

থিয়জফিষ্ট মহলে ক্ষেত্রবাবুর পসারের আর সীমা নাই—কিন্তু ইহাতে তিনি কিছু-

মাত্র সান্ত্বনা লাভ করিলেন না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। ভয়ে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিতেও পারিলেন না। তাঁহার অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ আর নাই!

চৈত্রমাস আসিল—বসন্তের বাতাস বহিতেছে। দোল উপলক্ষ্যে কাছারি বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাড়ীতে বসিয়া নিজ দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল, হালিসহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে মহাবিপদ উপস্থিত। দোল উপলক্ষ্যে বাজি পোড়াইতে গিয়া, একটা বোম ফুটিয়া তাঁহার ছোট সম্বন্ধী সুবোধ বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে হুগলীর হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

শুনিয়া ক্ষেত্রবাবু থাকিতে পারিলেন না—গাড়ী ভাড়া করিয়া হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, ছেলেটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বিছানার নীচে মেঝের উপর বসিয়া বিধবা বিনোদিনী রোদন করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনকে দেখিয়া তিনি আরও রোদন করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন ঔষধ-প্রয়োগ ও শুশ্রূষা চলিল। সন্ধ্যার দিকে ডাক্তারেরা বলিল আর প্রাণের আশঙ্কা নাই।

ক্ষেত্রমোহন শ্যালিকাকে বলিলেন—"ঠাকুরঝি, সন্ধ্যা হল—এইবার বাড়ী চল।"

বিনোদিনী বলিলেন—"আমি সুবোধকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারব না।"

"সমস্ত দিন অনাহারে আছ—স্নানাহার পর্য্যন্ত হল না।"

"তা না হোক! আমি যেতে পারব না।"

অবস্থা বুঝিয়া হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলিলেন—"আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে ত রাত্রে থাকতে পাবেন না। কাল সকালে আবার আসবেন এখন। আর কোন ভয় নেই। বিপদ যা তা কেটে গেছে। আমরা সেবা শুশ্রূষা করব—আপনার কোন চিন্তা নেই—আপনি বাড়ী যান।"

অনেক বুঝাইতে, বিনোদিনী সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রমোহনকে বলিলেন—"তুমি তবে আমায় হালিসহরে নিয়ে চল। রাত্রে সেখানে থাকবে। কাল ভোরে আবার এখানে আমায় পৌঁছে দিতে হবে।"

ক্ষেত্রমোহন তাহাই করিলেন। হালিসহরে রাত্রি কাটিল।

ভোরে উঠিয়া স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ক্ষেত্রমোহন ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় বাড়ীর বাহিরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহিরে গিয়া দেখিলেন, লালপাগড়ীতে বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে।

অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দুয়ারে দাঁড়াইয়া। সঙ্গে কয়েকজন দারোগা ও হেড কনেষ্টবলও আছে।

পুলিস সাহেবের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর পরিচয় ছিল। নত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিলেন।

সাহেব চুরুট মুখে বলিলেন—"হেল্লো মুখ‌্টিয়ার, টুমি হেথানে খি খড়িতেছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"হুজুর, এই আমার শ্বশুরবাড়ী।"

"ইহা টোমার শ্বশুরবাড়ী আছে? উটম, হামি টোমার শ্বশুরবাড়ী সার্চ্চ খড়িবে।"

"কেন হুজুর?"

"হেথানে বোমা টৈয়াড়ি হয় কিনা ডেখিবে। ইহা সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট আছে।"—বলিয়া সাহেব সার্চ্চ ওয়ারেণ্টখানি ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু সেখানি উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিয়া, সাহেবের হাতে ফিরাইয়া দিলেন। বলিলেন—"হুজুর মালেক—যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

সাহেব বলিলেন—"স্ত্রীলোক ঘনকে লুকাইয়া রাখ।"

পুলিস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেবল বিনোদিনী। তিনি পুলিসের ভয়ে কোথাও লুকাইবার প্রয়োজন দেখিলেন না। হরিনামের মালাটি হাতে করিয়া উঠানে তুলসীতলায় বসিয়া রহিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। বন্দুক, বারুদ, ডিনামাইট, বোমা, বর্ত্তমান রণনীতি, যুগান্তর, গীতা, দেশের কথা, রিভিউ অব্ রিভিউজ প্রভৃতি কিছুই বাহির হইল না। বাহির হইল—হিন্দু সৎকর্ম্মমালা, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, কাশীদাসী মহাভারত এবং একখানা বটতলার ছেঁড়া উপন্যাস। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দেশনায়কের কোনও ছবি বাহির হইল না—বাহির হইল কেবল খানকতক কালীঘাটের পট এবং একখানা আর্ট ষ্টুডিওর গণেশ মূর্ত্তি। জমিদারের খানকতক পুরাতন দাখিলা এবং একটা ধূলিমলিন চিঠির ফাইল বাহির হইল। বিনোদিনীর বাক্স হইতে বাহির হইল এক বাণ্ডিল চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাদা খাম।

সমস্ত জিনিষ উঠানে আনিয়া জমা করা হইল। একজন দারোগা কাগজপত্রগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন, শাদা খামগুলির প্রত্যেকখানিতে তাঁহারই শিরোনামা লেখা এবং রসময়ীর হস্তাক্ষর! পুলিস সাহেবের অনুমতি লইয়া খাম ও চিঠিগুলি ক্ষেত্রবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খান কুড়ি চিঠি রহিয়াছে—সমস্তই বেগুনী রঙের ম্যাজেণ্টা কালিতে,

রসময়ীর হস্তাক্ষরে লিখিত। কয়েকখানি চিঠি খুলিয়া ক্ষেত্রবাবু পাঠও করিলেন। নানা অবস্থা কল্পনা করিয়া অনুমানে পত্রগুলি লিখিত। কোন কোনটাতে বটগাছে বাসস্থানেরও উল্লেখ আছে। একখানাতে আছে—"গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আসিয়াছ বলিয়া মনে করিও না আমি আর তোমার অনিষ্ট করিতে পারি না। এখনও রসি বামনী তোমার ঘাড় মটকাইতে পারে।" একখানাতে রহিয়াছে—"শুনিলাম বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, এখনও সাবধান।" একখানাতে আছে—"কল্য তোমার বিবাহ। এত মানা করিলাম কিছুতেই শুনিলে না। আচ্ছা বাসরঘরে আগুন জ্বালাইয়া তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়াইয়া মারিব।" ইত্যাদি।

সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত তখন ক্ষেত্রমোহনের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"ঠাকুরঝি, এসব কি?"

ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

[পৌষ, ১৩১৬]

মাতৃহীন

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে দিন সংবাদ বাহির হইল আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় বার অকৃতকার্য্য হইয়াছি, সেদিন একটু যে মনঃক্ষুণ্ণ হই নাই এমন কথা বলিতে পারি না। অথচ পরীক্ষোত্তীর্ণগণের তালিকায় শরৎকুমার মিত্র নামটি ছাপা না হওয়া সম্বন্ধে এক প্রকার কৃতনিশ্চয় ছিলাম। তাহার কারণ এই যে, সারা বৎসর আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নানা গুরুতর কার্য্যে নিরতিশয় ব্যস্ততা প্রযুক্ত পাঠ অভ্যাসের মোটেই সময় পাই নাই। পাস হইতে পারিব না এই ধারণা পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতে আমার ছিল, এবং লিখিয়া আসিয়া সে মত পরিবর্ত্তনের কোনও প্রয়োজন বিবেচনা করি নাই।

ফেল হইয়া অবনতমস্তকে আমার বেজওয়াটারের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তখন নভেম্বর মাস। সারা দিনে সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে। ভিতর ও বাহির হইতে অন্ধকারের চাপে আমার বুকটা

যেন পিষিয়া যাইতে লাগিল। আমার বাসার অনতিদূরেই "দি আর্টেজিয়ান" নামক একটি দোকান ছিল, সেখানে মনের আঁধারের ঔষধ বিক্রয় হইত। ল্যাণ্ডলেডিকে ডাকিয়া সেই ঔষধ এক বোতল আনাইয়া লইলাম। সোডাওয়াটার অনুপানযোগে কয়েক মাত্রা তাহা সেবন করিতেই আমার মন হইতে মেঘান্ধকার কাটিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে তথায় নবোদিত সূর্য্যের অপার আলোক অনুভব করিলাম। মনে হইল—"উঃ—ভাগ্যিস ফেল হইয়াছি। নহিলে ত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিবার মতি হইত না। বৎসরখানেক পরিশ্রম করিলেই সব পরীক্ষাগুলি পাস করিতে পারিব—টার্ম ত আমার কমপ্লিট করাই আছে। ব্যারিষ্টারিতে বিপুল অর্থোপার্জন আমার অদৃষ্টে রহিয়াছে, বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে? আমার পিতা ব্যারিষ্টারি করিয়া বিস্তর টাকা রোজগার করিয়াছিলেন—আমিও বাপকা বেটা হইব, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।"—আমার সঙ্গে একত্র পরীক্ষা দিয়া যাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের জন্য মনে দুঃখও হইল। ভাবিলাম, —"আহা বেচারিরা সারাজীবন খাটিলেও মাসে দুই তিন হাজার টাকার বেশী উপর্জ্জন করিতে পারিবে না। আর দশ বৎসর পরে হাইকোর্টের সেই প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, মক্কেলকুলের মাথার মণি, মিষ্টার শরৎ মিত্র?"—দশ বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু মক্কেলেরা যে উক্ত দুর্লভ রত্নের সন্ধান পাইয়াছে এমন ত কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না!

সে কথা যাউক—আমার বর্ত্তমান অবস্থা এ গল্পের বিষয়ীভূত নহে। তৎকালে বিলাতে কি ঘটিয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিবার জন্য অদ্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সন্ধ্যার পর সাজসজ্জা করিয়া থিয়েটারে চলিয়া গেলাম। আমার সঙ্গে কেহ ছিল না—আমি একা। শেক্সপিয়ার প্রণীত একখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় হইল। অভিনয় দর্শনে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। আমি বারটার সময় বাসায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধটি আরও দুই এক মাত্রা সেবন করিয়া শয়নের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। শেক্সপিয়ারের নাটকের কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে—মাত্রা বাড়িয়া গেল। তখন মনে হইল,—কি আক্ষেপ বাঙ্গালা দেশে একজনও শেক্সপিয়ার নাই। আমি কি ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয় শেক্সপিয়ার হইতে পারি না? কেন পারিব না? যখন দেশে ছিলাম, "বিশ্বদর্পণ" নামক মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে আমার কবিতা ছাপা হইত। তখনি বন্ধুরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, কালে আমি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইয়া দাঁড়াইব। আমার ভিতরে প্রতিভার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ রহিয়াছে—ইহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম। আমি বঙ্গের ভবিষ্যৎ শেক্সপিয়ার তাহাতে সন্দেহ মাত্র রহিল না। কল্যই একটা ঐতিহাসিক নাটক রচনা আরম্ভ

করিয়া দিব। "রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—এই কথাগুলি অনুচ্চস্বরে বারম্বার বলিতে বলিতে জিহ্বা জড়াইয়া আসিল। তখন উঠিয়া কোন ক্রমে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন নয়টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি, তুষারপাত হইতেছে। তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সমাধা করিয়া মহোৎসাহে সেই তুষারের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলাম। অম্‌নিবাসে আরোহণ করিয়া বৃটিশ মিউজিয়মে গিয়া উপস্থিত। একশিলিং দিয়া একখানি চকচকে বাঁধানো খাতা কিনিয়া, মিউজিয়মের পাঠাগারে (Reading Room) প্রবেশ করলাম। এই খাতাখানিই বঙ্গীয় শেক্সপিয়ারের সর্ব্বপ্রথম নাট্যরচনা বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে।

বৃটিশ মিউজিয়মের এই পাঠাগার জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজাতির সর্ব্ববিদ্যা এখানে পুঞ্জীভূত। এই সুবিপুল পাঠাগারটির তলদেশ বৃত্তাকার। কেন্দ্রস্থলে কতকটা স্থান কর্ম্মচারিগণের বসিবার জন্য। সেই স্থানটি দিয়া বৃত্তাকারে সজ্জিত তিনসারি পুস্তকাধার—তাহাতে সহস্রাধিক খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থ তালিকা রক্ষিত। এই তালিকা বর্ণানুক্রমিক—গ্রন্থকারের নামানুসারে এবং বিষয়ানুসারে সঙ্কলিত। তাহার পর হইতে ব্যাসার্দ্ধের আকারে বহু সারি টেবিল—প্রত্যেক টেবিল বহু পাঠকের উপবেশন কল্পে বিভক্ত ও সংখ্যাকৃত।

পাঠাগার বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখনও অধিক সংখ্যক পাঠ্যার্থী আগমন করেন নাই। আমি আসন গ্রহণ করিয়া, তালিকা হইতে খুঁজিয়া রাজপুত ইতিহাসের দুইখানি গ্রন্থের নাম লিখিয়া দিয়া আসিলাম। দশমিনিট পরে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বহি দু-খানি দিয়া গেল।

তখন সেই ইতিহাস গ্রন্থ খুলিয়া আমার নাটকের বিষয় নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম। নায়ক পদের জন্য একজন রাজা আবশ্যক—যিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া দুই একটা বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। সে যুদ্ধ দেশের জন্যই হউক, অথবা নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্যই হউক কিছু আসে যায় না—যুদ্ধকালে তাঁহার মুখে আমি দেশভক্তির সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা বসাইয়া দিব, তজ্জন্য চিন্তা নাই। রাজা অপেক্ষা রাজপুত্র হইলেই ভাল হয়, কারণ রাজা প্রায়ই অবিবাহিত পাওয়া যায় না। তাঁহাকে প্রেমে পড়াইবার সুযোগ অতি দুর্লভ। নায়ক যে ললনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—তাঁহার নামটি কটমট হইলে চলিবে না। নামটি যদি মোলায়েম হয়, তবে তিনি সঙ্গীতকুশলা বা অশ্বারোহণদক্ষা না

হইলেও ক্ষতি নাই—আমি তাঁহার ও সকল অক্ষমতা দূর করিয়া দিবার ভার লইতে পারি। এক ঘণ্টার অধিক কাল এইরূপ নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর দেখিলাম, একজন বর্ষীয়সী শুভ্রকেশিনী ইংরাজমহিলা ধীর পদক্ষেপ পাঠাগারে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার হস্তে কালো চামড়ার একটি "কেস" বা আধার ঝুলিতেছে—এইরূপ আধারে চিত্রকরগণ তাঁহাদের চিত্রলিখনের সরঞ্জাম রাখিয়া থাকেন। আমি সেখানে বসিয়াছিলাম, বৃদ্ধা সেই দিকেই আসিতে লাগিলেন। আমার কাছাকাছি আসিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া, তিনি যেন স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। দেখিলাম, পরক্ষণেই আবার আত্মসম্বরণ করিয়া মৃদু মন্দ গমনে আমাকে ছাড়াইয়া গেলেন এবং আমার স্থান হইতে চারি পাঁচটি আসনের ব্যবধানে উপবেশন করিলেন।

আমি ভাবিলাম, বৃদ্ধা ক্ষীণদৃষ্টি—আমাকে প্রথমে কোন পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকিবেন। এ তুচ্ছ ঘটনা আমার মনে অধিক্ষণ স্থান পাইলনা—আমি আবার নায়ক-মৃগয়ায় ব্যাপৃত হইলাম। এইরূপে আরও কিছুক্ষণ কাটিল। মনোমত নায়কের সন্ধান না পাইয়া, আরও দুই একখানা পুস্তকের অন্বেষণে যাইতেছিলাম। সেই মহিলাটির নিকট দিয়া যাইতে দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখে দুই তিনখানি ভারতবর্ষীয় ছবির পুস্তক খোলা রহিয়াছে—আর তিনি কাগজে পেন্সিল দিয়া একটা জঙ্গল আঁকিতেছেন। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, জঙ্গলের অন্তরালে একটা বাঘ থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে, হস্তিপৃষ্ঠ হইতে সৈনিকবেশধারী একজন ইংরাজ পুরুষ তার প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিতেছেন।

ক্রমে একটা বাজিল—লাঞ্চের সময় উপস্থিত। বহি স্বস্থানে রাখিয়া আমি বাহির হইয়া গেলাম। অল্প দূরেই ভিয়েনা রেষ্টোরাঁ নামক ভোজনশালা ছিল, তথায় প্রবেশ করিয়া খাইতে বসিলাম।

দুই এক মিনিট পরেই দেখি, সেই বৃদ্ধাটিও প্রবেশ করিলেন। আমারই টেবিলে আমার সম্মুখস্থিত চেয়ারখানি দখল করিলেন। আমার পানে চাহিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন—"Good afternoon—আপনি এইমাত্র বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে ছিলেন না?"

আমি তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলাম—"আমি আপনার আসন হইতে অল্প দূরেই উপস্থিত ছিলাম।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আমায় ক্ষমা করিবেন—আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন?"

"আমি বাঙ্গালী।"

"কলিকাতার ?''

আমি বলিলাম—"কলিকাতাতেই আমাদের নিবাস।"

বৃদ্ধা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আমার এ সকল প্রশ্নে আপনি বিরক্ত হইতেছেন না ত? আমি শুধু অলস কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছি না।"

আমি বলিলাম—"সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আপনার যাহা জানিবার আছে আপনি অনুগ্রহ করিয়া অবাধে আমায় জিজ্ঞাসা করুন।"

"বহু ধন্যবাদ। পঞ্জাব কিংবা মধ্যভারতে আপনি বেড়াইয়াছেন কি?

"মধ্যভারতে কখনও যাই নাই, তবে পঞ্জাবের কয়েকটি নগর দেখিয়াছি।"

এই সময় পরিচারক আসিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইল। "আমায় এক মুহূর্ত্ত ক্ষমা করুন"—বলিয়া বৃদ্ধা, খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া, স্বেচ্ছামত দ্রব্যগুলি ফরমাস করিলেন। তাহার পর আমায় বলিলেন—"আমার জিজ্ঞাস্য কি, আপনাকে বুঝাইয়া বলি। আমি কয়েকটি বিখ্যাত মাসিকপত্রের জন্য ছবি আঁকিয়া থাকি। ভারতবর্ষই আমার বিশেষ বিষয়। সম্প্রতি কোনও পত্র সম্পাদক একটি ভারতীয় শিকারের গল্প আমায় ছবি আঁকিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। গল্পটি এই—পঞ্জাবের একজন রাজা এবং একজন বৃটিশ সৈনিক একত্র হস্তিপৃষ্ঠে জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। দূর হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া রাজার মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি হস্তী হইতে নামিয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজ সৈনিক শব্দানুসারে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঘকে গুলি করিলেন। এ গল্পের জন্য সম্পাদক দুই একখানি ছবি চাহেন। একখানি রাজার পলায়নের ছবি, দ্বিতীয়খানি বাঘ মারিবার ছবি। দ্বিতীয়খানি আমি আঁকিতেছি। কিন্তু প্রথমখানি সম্বন্ধে আমি বড় সমস্যায় পড়িয়াছি। ভারতবর্ষের রাজাদের যে পোষাক দরবার প্রভৃতির ছবিতে দেখা যায়, সেই পোষাক পরিয়াই তাঁহারা শিকার করিতে যান, অথবা শিকারের উপযুক্ত অন্য কোনও রূপ পোষাক আছে?"

এই কাহিনী শুনিয়া আমার রক্ত গরম হইয়া গেল। আমি যথাসাধ্য আত্মসংযমের সহিত বলিলাম—"মহাশয়া, ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া রাজা পলাইলেন কেন? ইংরাজ সৈনিক ত ভয়ে পলাইতে পারিত এবং রাজা গিয়া সে ব্যাঘ্রকে শিকার করিতে পারিতেন।"

আমার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মহিলাটি মৃদুহাস্য করিলেন। বলিলেন—"আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, আমি ও গল্পের লেখক নহি। আমি পারিশ্রমিক লইয়া ছবি আঁকিব মাত্র।"

আমি তখন লজ্জিত হইলাম। বলিলাম—“আমি অন্যায় করিয়াছি—আমায় ক্ষমা করিবেন। স্বদেশবাসীর নিন্দা শুনিয়া হঠাৎ আমার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।”

বৃদ্ধা বলিলেন—“আপনার দেশভক্তি দেখিয়া প্রীত হইলাম। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।”

আমি বলিলাম—“আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইল। আমি স্বচক্ষে যে দুই চারিটা রাজা দেখিয়াছি—তাহা হয় কলিকাতার রাজপথে, নতুবা রেলওয়ে ট্রেনে। শিকারে বাহির হইয়াছেন এমন রাজা দেখিবার কোনও সুযোগ পাই নাই।”

ইহা শুনিয়া মহিলাটি কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—“কল্য একবার ভাল করিয়া সচিত্র পুস্তকাদি অন্বেষণ করিয়া দেখিব, শিকার পরিচ্ছদে কোনও রাজার ছবি পাওয়া যায় কি না।”

অতঃপর অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমি এদেশে কত দিন আছি প্রভৃতি বিষয় তিনি অতি সঙ্কোচের সহিত আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে নিজের একখানি কার্ড আমায় দিয়া বলিলেন—“আমার বাসা নিকটেই। যদি অবসর মত একদিন আসেন তবে আমার অঙ্কিত অনেকগুলি রেখাচিত্র আপনাকে দেখাইতে পারি।”

আমি এ সদয় নিমন্ত্রণের জন্য তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ দিয়া, আমার নিজের একখানি কার্ড তাঁহাকে অর্পণ করিলাম। আমার নামটি দেখিয়া তিনি বলিলেন—“মিত্র? কলিকাতার সেই পরলোকগত প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মিত্র আপনার কেহ হইতেন নাকি?”

আমার পিতার যশোব্যাপ্তির প্রমাণ পাইয়া গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। বলিলাম—“আমি তাঁহারই পুত্র। আপনি তাঁহার নাম শুনিলেন কি করিয়া?”

বৃদ্ধা বলিলেন “সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে একটা অবিকৃত ধারণা করিয়া লইবার জন্য মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গিয়া কলিকাতার সংবাদপত্র আমি পাঠ করিয়া থাকি। উঃ—আজ এ ভোজনশালায় লোকের কি ভীড় হইয়াছে! গরমে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। আমি চলিলাম।”—বলিয়া তিনি উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার পর দুইদিন মহিলাটিকে আর বৃটিশ মিউজিয়মে দেখিলাম না। এ দুইদিনে আমার নাটকের প্লট স্থির করিয়া রচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

তৃতীয় দিন রাজপুত ইতিহাসের অন্যান্য পুস্তকের জন্য তালিকা অনুসন্ধান করিতেছি,

এমন সময় দেখিলাম সেই বৃদ্ধা—কার্ড হইতে জানিয়াছিলাম—ইহার নাম মিস্ ক্যাম্বেল—আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইলেন। সহাস্যবদনে আমায় অভিবাদন করিয়া নিজ কর প্রসারিত করিয়া দিলেন। করমর্দ্দন ও কুশল প্রশ্ন শেষ হইলে তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"রাজপুতানা আপনি দেখিতেছেন বুঝি ?"—বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে স্বাভাবিক স্বরে বাক্যকথন নিষিদ্ধ।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"আপনার কি এই খণ্ড আবশ্যক? এই লউন, আপনার হইলে আমি দেখিব এখন।"

"আসুন না, দুইজনে এক সঙ্গেই দেখি। রাজাদের শিকার-পরিচ্ছদ বিবরণ দেখিবার জন্য আজ রাজপুতানার ইতিহাস অন্বেষণ করিব। আপনি কি খুঁজিতেছেন ?"

"আমি রাজপুত ইতিহাস হইতে একখানা নাটক লিখিতেছি।"

"আপনি নাট্যকার ?"

লজ্জিতভাবে বলিলাম—"আমি নাট্যকার নহি। তবে একখানি নাটক রচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি বটে।"

"বেশ বেশ—একদিন আপনার নাটকের গল্পটি শুনিব।"

"সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা"—বলিয়া তাঁহার জন্য আমি কয়েকখানি পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম। উভয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

আমি প্রত্যহই পাঠাগারে গিয়া নাটক লিখিতে লাগিলাম। মিস্ ক্যাম্বেলও প্রতিদিন আসিতেন। কিন্তু আর কোনদিন তাঁহাকে ভিয়েনা রেস্তোরাঁতে যাইতে দেখিলাম না। তিনি সম্ভবতঃ বাড়ী গিয়া লাঞ্চ খাইয়া আসিতেন।

একদিন তাঁহার বসিবার স্থানে গিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিলাম—"আজ বিকালে আপনার ওখানে ছবি দেখিতে আসিব কি ?"

তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"বেশ ত। নিশ্চয়ই আসিবেন। আজ আমার ওখানেই আপনাকে চা পান করিতে হইবে। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব এখন।"

"বহু ধন্যবাদ"—বলিয়া আমি স্বস্থানে আসিয়া নিজ কার্য্যে মন দিলাম।

বেলা তিনটা বাজিলে মিস্ ক্যাম্বেল আসিয়া বলিলেন—"চলুন যাওয়া যাক্।"

আমি পাঠাগারে পুস্তক ফিরাইয়া দিয়া, নাটকের খাতাখানি লইয়া, মিস্ ক্যাম্বেলের সঙ্গে তাঁহার আবাসে গমন করিলাম। ব্লুমসবরি ম্যানসনস্ নামক একটি সুবৃহৎ

অট্টালিকার একটি ফ্ল্যাট লইয়া বৃদ্ধা বাস করেন। ফ্ল্যাটের একটি কক্ষে তাঁহার চিত্রশালিকা (Studio)—সেখানে লইয়া গিয়া আমাকে বসাইলেন। বলিলেন—"পাঁচ মিনিটের জন্য আমায় মার্জ্জনা করুন। পাচিকাকে চায়ের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসি। আপনি ততক্ষণ দেয়ালের এই ছবিগুলি দেখুন।"—বলিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমি অলসভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছবিগুলি দেখিতে লাগিলাম। অধিকাংশই জলবর্ণের চিত্র। বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নীলহ্রদ, নৃত্যশীলা শৈলনির্ঝরিণী, সিন্ধুজলধৌত সিকতাভূমি—প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য। দুই একখানি তৈলচিত্রও আছে। ঈজেলের উপর স্থাপিত একটি অর্দ্ধসমাপ্ত নারীমূর্ত্তিও দেখিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিস্ ক্যাম্বেল ফিরিয়া আসিলেন। ছবিগুলি একে একে আমায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন—"এইগুলি আমার সাধের ছবি। শিল্পকলার সাধনার জন্য এইগুলি আমি আঁকিয়াছি। জীবিকার জন্য যে সকল ছবি আমায় আঁকিতে হয়,—যেমন পলায়নপর রাজা প্রভৃতি—এইবার সেইগুলি দেখুন—বলিয়া তিনি একটি বৃহৎ পোর্টফোলিও বাহির করিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনার সে ছবির কি করিলেন?"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন—"দরবারের বেশেই রাজাকে আঁকিয়া দিতে হইয়াছে। আমি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করিয়া পরিচ্ছদ সমস্যার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—সাময়িক পত্রের ছবিতে অত খুঁটিনাটি ধরিতে গেলে চলে না। রাজাকে বেশ স্থূলকায় করিয়া আঁকিয়া, তাঁহার অঙ্গে দরবারের পোষাকই পরাইয়া দিন। নহিলে পাঠকেরা রাজা বলিয়া চিনিতে পারিবে কেন?—সুতরাং আমাকে সেইরূপই আঁকিতে হইল।"

পোর্টফোলিওর ছবিগুলি দেখিলাম, অধিকাংশই গল্প বা উপন্যাসের উপযোগী করিয়া চিত্রিত। সেগুলি দেখিতে দেখিতে চা প্রস্তুত হইবার সংবাদ আসিল। মিস্ ক্যাম্বেল আমাকে লইয়া তাঁহার ড্রয়িংরুমে গেলেন।

চা পান করিতে করিতে গল্প হইতে লাগিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার চকচকে বাঁধান খাতাখানি তুলিয়া মিস্ ক্যাম্বেল দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন—"এইখানিই আপনার নাটক বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কতদূর হইল?"

"তৃতীয় অঙ্ক হইতেছে। আরও দুইটি অঙ্ক হইবে।"

তিনি খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন—"ইহার গল্পটি কি বলুন দেখি ?"

আমি গল্পটি বর্ণনা করিতে লাগিলাম। ঘটনা সন্নিবেশ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে তিনি পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিলেন। দেখিলাম, সেগুলি অত্যন্ত উপযোগী ও সমীচীন। অবশেষে খাতাখানি রাখিয়া তিনি বলিলেন—"আমার আক্ষেপ এই যে, আপনার রচনা পাঠ করিবার আনন্দ আমি লাভ করিতে পারিব না। অথচ আমি এক সময় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"বাঙ্গালা শিখিতেছিলেন ? কি চমৎকার ! কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন ?"

"যৎসামান্ত।"

"এখনও কিছু কিছু মনে আছে ?"

"না। সে বহু বৎসরের কথা। এইটুকু মাত্র মনে আছে, গোপাল এবং রাখাল দুইটি বালক ছিল। ইহাদের মধ্যে রাখালকেই আমার বেশ লাগিত—তাহার ভিতরে যথেষ্ট প্রাণ ছিল। গোপালটা একেবারে অপদার্থ—যাহাকে আমরা goody goody বলি।"

আমি শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। বলিলাম—"আপনার যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিতেছি, আপনি যদি আবার চেষ্টা করেন, অল্পদিনেই বাঙ্গালা শিখিয়া ফেলিতে পারেন !"

মিস্ ক্যাম্বেল বলিলেন—"এ বয়সে আর শিখিয়া কি হইবে ? যখন শিখিতাম, তখন আমি বিংশতিবর্ষীয়া বালিকা।"—বলিয়া তিনি অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন দিবালোক অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখ আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তথাপি আমার সন্দেহ হইল, তাঁহার চক্ষু দুইট যেন জলে ছলছল করিতেছে। তাঁহার চিত্ত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিলাম—"আর এক পেয়ালা চা পাইতে পারি কি ?"

তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"ক্ষমা করিবেন—আপনার পেয়ালা খালি হইয়াছে আমি লক্ষ্যই করি নাই। আমার আতিথেয়তা মোটেই প্রশংসনীয় নহে"—বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে আমার পেয়ালা লইয়া চায়ে পূর্ণ করিয়া দিলেন। বলিলেন—"আপনি ঐতিহাসিক নাটকই লিখিবেন, না গার্হস্থ্য নাটকও লিখিবার ইচ্ছা আছে ?"

"ক্রমে গার্হস্থ্য নাটকও লিখিব বইকি।"

"আমি আপনাকে একটি গার্হস্থ্য নাটকের প্লট দিতে পারি। বাস্তব জীবনের ঘটনা—একটি হৃদয়ভেদী প্রণয়-কাহিনী।"

আগ্রহের সহিত বলিলাম—"বহু ধন্যবাদ। প্লটটি কি বলুন না।"

"আগে এই নাটকটি শেষ করুন। তাহার পর একদিন বলিব।"

আরও দশ মিনিট গল্পে কাটিলে অন্ধকার বাড়িয়া উঠিল। পরিচারিকা আসিয়া গ্যাস জ্বালিয়া দিল। আমি তখন মিস্ ক্যাম্বেলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম।

তিনি উঠিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে বলিলেন—"আপনার নাটক সমাপ্ত হইলে, একদিন আসিয়া অনুবাদ করিয়া আমায় শুনাইতে হইবে মনে রাখিবেন।"

"আমি সেই সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব"—বলিয়া, অভিবাদনান্তর বিদায় হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার ঐতিহাসিক নাটক শেষ হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ পাঠাগারেই মিস্ ক্যাম্বেলকে দিয়াছি। ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্টতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমি তাঁহার আবাসে আরও দুইবার চা পান করিয়াছি। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারি, আমাকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করেন।

একদিন বৃটিশ মিউজিয়মে তিনি আমায় বলিলেন—"কল্য আমার হাতে কোন কাজ নাই। তোমার নাটকখানি শুনাইবে?"

"বেশ ত। কাল কখন আসিব বলুন?"

"কাল পাঠাগারে আসিবে কি?"

"আসিব।"

"তবে নাটকখানি সঙ্গে আনিও। এখান হইতে একটার সময় গিয়া কাল আমার সঙ্গে তুমি লাঞ্চ খাইও।"

"বহু ধন্যবাদ। আপনি কাল আসিতেছেন কি?"

"না, আমি আসিব না।"

"আচ্ছা, আমি তবে একটার সময় আপনার আবাসে উপস্থিত হইব।"

"তখন ডিসেম্বর মাস। শীতটা খুবই প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই তুষারপাত হয়।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম—বৃষ্টি পড়িতেছে।

প্রাতরাশ সমাপন করিতে নয়টা বাজিল—বৃষ্টি থামিল না। দশটা বাজিল, তবু থামে না। আমার ল্যাণ্ডলেডি প্রচলিত প্রবাদবাক্য* কোট্ করিয়া বলিল,—সাতটার পূর্ব্বেই যখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে এগারটার মধ্যে নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। কিন্তু এগারটা বাজিবামাত্র, ল্যাণ্ডলেডির ভবিষ্যদ্বাণীর যেন প্রতিবাদ করিবার জন্যই, বৃষ্টি প্রবলতর ভাবে আরম্ভ হইল। বারোটা বাজিল, তখনও তদ্রূপ। অন্য সময় হইলে এমন দিনে আমি বাহির হইতাম না। কিন্তু আজ প্রথম রসগ্রাহী ব্যক্তি আমার প্রথম রচনা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। আজ কি আমি থাকিতে পারি? ক্যাব ডাকাইয়া মিস্ ক্যাম্বেলের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"How very sweet of you to come in this weather! তোমার জুতা বোধ হয় ভিজিয়া গিয়াছে?"

আমি বলিলাম—"বেশী ভেজে নাই। আমি ত বৃটিশ মিউজিয়মে যাই নাই। বাসা হইতে ক্যাবে আসিয়াছি। তবে উঠিবার নামিবার সময় অল্প ভিজিয়া থাকিবে।"

আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না। ঝুঁকিয়া, আমার জুতা দেখিয়া বলিলেন—"এই যে বেশ ভিজিয়াছে। খুলিয়া ফেল, খুলিয়া ফেল।"

একজন মহিলার সম্মুখে জুতা খুলিয়া ফেলিবার প্রস্তাব মাত্রে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমার ভাব দেখিয়া বলিলেন—"Silly boy! তুমি এমন horrified হইতেছ কেন? সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। খুলিয়া ফেল, নহিলে শক্ত ব্যারামে পড়িবে।"

আমি অপরাধীর মত বলিলাম—"বেশী ত ভিজে নাই। বরং আগুনের কাছে পা রাখিয়া বসিয়া থাকি, জুতা শুকাইয়া যাইবে এখন।"

তিনি বলিলেন—"খুব ভিজিয়াছে। তবে জল এখনও তোমার মোজায় পৌছে নাই, মোজাও ভিজিয়া গেলে সর্ব্বনাশ হইবে। জুতা খুলিয়া আগুনের কাছে রাখ। লাঞ্চের এখনও বিলম্ব আছে। দাসী আসিবার পূর্ব্বেই তোমার জুতা শুকাইয়া যাইবে।"

আমি তথাপি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন—"নহে ত বল আমি অন্য ঘরে যাই। তোমার জুতা না শুকান পর্য্যন্ত আসিব না! তোমার মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহার সম্মুখে তুমি কি জুতা খুলিতে না? আমাকে তোমার মা মনে কর না কেন?

* Rain before seven, clear before eleven.

তাঁহার শেষ কথাগুলি এতই করুণা মাখা, আমার মাতৃহারা হৃদয়ে এমনই সুধাবৃষ্টি করিল যে, আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া জুতা খুলিয়া ফেলিলাম।

তখন দুইজনে আমরা অগ্নির সম্মুখে বসিয়া নানা কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম। ক্রমে দেড়টা বাজিল। আমার জুতাও শুকাইয়া গেল। জুতা পরিয়া আবার আমি ভদ্রলোক হইলাম।

মিস্ ক্যাম্বেল তখন লাঞ্চ আনিবার জন্ত দাসীকে বলিয়া আসিলেন। ক্ষণকাল পরে আমাকে তাঁহার ভোজনকক্ষে লইয়া গেলেন। গল্প-গুজবের মধ্যে আমরা আহার সমাধা করিলাম। দাসী টেবিল সাফ করিয়া লইলে, সেই কক্ষেই বসিয়া আমার নাটক পাঠ আরম্ভ করিলাম। কতকগুলো দৃশ্যের গল্পভাগ মুখেই বলিয়া গেলাম। যে যে দৃশ্যে আমার রচনার বিশেষ বাহাদুরী আছে মনে করিলাম সেই সেই দৃশ্য অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলাম। মোটের উপর, তিনি প্রীত হইলেন। বলিলেন —"প্রথম উদ্যমের পক্ষে খুবই ভাল হইয়াছে।" এইরূপে চারিটা বাজিল। চা পান করা গেল।

এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশ অন্ধকার। আমি বলিলাম—"আপনি আমায় একটি গার্হস্থ্য নাটকের প্লট দিবেন প্রতিশ্রুত আছেন,—আজ সেটি বলিবেন কি?"

"বলিব। ড্রয়িং-রুমে চল, সেইখানে বলিব। এ ঘরটা শীঘ্র অন্ধকার হইয়া যায়।"

আমরা ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কুণ্ডস্থিত অগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায়। চারিদিকের বায়ুপথরোধী সার্সি বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি কনকনে শীত। দাসী আসিয়া কুণ্ডে প্রচুর পরিমাণে কয়লা নিক্ষেপ করিয়া, পোকর দিয়া খুব খোঁচাইয়া দিল। অগ্নিদেব তখন আবার নবোদ্যমে জ্বলিতে লাগিলেন।

মিস্ ক্যাম্বেল তাঁহার পশমের শালখানি গায়ে বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"এই লণ্ডনের অনতিদূরে একটি সহরতলিতে—তোমার নাটকে উহা হ্যামারস্মিথ বা রিচমণ্ড বলিয়া লিখিতে পার—একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহাদের একটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা ছিল। পুত্রটি একবিংশতি বর্ষীয়;—তাহার নাম কি রাখিবে? জর্জ্জ না হয় ফ্রেড্রিক। ফ্রেড্রিকের আদরের নাম ফ্রেড বেশ শুনাইবে। কন্যা দুইটির মধ্যে বড়টির নাম—মনে কর এলিজ্যাবেথ বা লিজি। এইটি তোমার নায়িকা। নামটা বড় সেকেলে—তোমার বুঝি পছন্দ হইল না? তবে তাহাকে মড্ কিম্বা গ্লাডিস বলিতে পার। মডের বয়স তখন ঊনবিংশতিবর্ষ। কনিষ্ঠা ক্যাথরিন,

মডের অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

"লেখাপড়ার দিকেই বড় মেয়েটির বেশী ঝোঁক ছিল। সে ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ভিক্টর হিউগো, গ্যইটে এবং ডাণ্টের মূলগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত। গ্রীকও শিখিতেছিল। ইতিমধ্যে কেমব্রিজ হইতে ফ্রেড তার মাকে পত্র লিখিল, সেখানে একটি ভারতবর্ষীয় তাহার সহপাঠী বন্ধু আছে, ইচ্ছা, ছুটির দেড়মাস তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া রাখে। মাতা আহ্লাদের সহিত সম্মতি দিলেন। ফ্রেড লিখিল অমুক তারিখে আমরা পৌঁছিব।

"মড্ কিন্তু এ সংবাদে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। পিতামাতাকে বলিল, ভারত-বর্ষীয় লোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে কেমন করিয়া থাকিবে? তাঁহারা যত বুঝাইলেন, কিছুতেই মডের শঙ্কা দূর হইল না। ফ্রেড বন্ধুসহ যে দিন পৌঁছিবে, তার পূর্ব্বদিন মড্ পলাইয়া লণ্ডনে তাহার মাসীর বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইল।

"দুই তিন দিন পরে, ফ্রেড ও তাহার বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, মাতা মড্‌কে আনিতে গেলেন। মড্ যখন দেখিল, ভারতবর্ষীয় লোকটির মাথায় পালকের টুপি নাই, রঙ মাখে না, হাতে তীর ধনুক নাই, ভালুকের চামড়া পরে না—তখন সে আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

"ক্রমে মড্ আবিষ্কার করিল—তিনি—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"নায়কের নামটি কি রাখিব?"

মিস্ ক্যাম্বেল বলিলেন—"তিনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের কি নাম হয় আমার চেয়ে তুমি ত ভাল জান। যাহোক একটা নাম রাখিয়া দিও।"

আমি ভাবিয়া বলিলাম—"চারুচন্দ্র দত্ত।"

"বেশ হইবে। ক্রমে মড্ জানিল, চারু সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন। তখন সে মাকে ধরিয়া বলিল, আমি সংস্কৃত শিখিব। চারু শুনিয়া বলিল—'বেশ ত। আমারও ফরাসী ভাষা শিক্ষার অত্যন্ত ইচ্ছা। আপনি আমায় ফরাসী পড়াইবেন আমি আপনাকে সংস্কৃত পাঠ দিব।'

"এইরূপে উভয়ে উভয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তখন মে মাস। আকাশ পরিষ্কার নীল। বাড়ীর পশ্চাতের বাগানটি বাটারকপ্, প্রিমরোজ ও ডেজি ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। বাগানের মাঝখানে একটি লাইলাকের গাছ তাহার সর্ব্বাঙ্গে তখন ফুল আর ধরে না। ঘরের মধ্যে গরম—তাই প্রভাতে ও বৈকালে, একটি চিনা-বেতের টেবিল আর দুখানি হাল্কা চেয়ার সেই লাইলাকের তলায় বিছাইয়া, তাহারা পরস্পরকে পাঠ দিত। গাছটির শাখায় ফুলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া একযোড়া

মেডিস পক্ষী সারাদিন প্রণয়গান গাহিত। ক্রমে দুজনের মনে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইল।

"মডের পিতামাতা এ ব্যাপারের কিছুই সন্ধান রাখেন নাই—কিন্তু ফ্রেড্ ঠিক ধরিয়াছিল।—সে, বোন্ দুটি এবং চারুকে সঙ্গে লইয়া কোনও দিন রিচমণ্ড পার্কে, কোন দিন কিউ গার্ডেন্সে বেড়াইতে যাইত। মড্ ও চারু—বেড়াইতে বেড়াইতে—অনেক সময় ক্যাথরিণ ও ফ্রেড্‌কে খুঁজিয়া পাইত না। ফ্রেডের কৌশলে এরূপ ঘটিত সন্দেহ নাই।

"ক্রমে চারু মনে করিল, মডের পিতামাতার নিকট আর ইহা গোপন রাখিলে তাহার পক্ষে অন্যায়াচরণ হয়। তখন সে মডের পিতার কাছে গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিল। মডের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল।

"সমস্ত শুনিয়া, মডের পিতা গম্ভীর হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি মড্‌কেও সেখানে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। স্নেহের স্বরে উভয়কে বলিলেন—তোমরা এখন দুজনেই অল্পবয়স্ক। সংসারাভিজ্ঞতা তোমাদের কিছুই নাই। পরস্পরের প্রতি তোমাদের এ আকর্ষণ—ইহা স্থায়ী প্রেম অথবা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র,—তাহারও পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিতে চারুর এখনও বৎসরাধিক কাল বিলম্ব আছে। আমি বলি, এ এক বৎসর তোমরা আত্মপরীক্ষা কর। এক বৎসর তোমরা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ করিও না। যদি বৎসরান্তে তোমাদের মনের ভাব এইরূপই থাকে—তবে তোমাদের পরিণয়ে আমি সম্মতি দিব।

"মড্ ও চারু এ কথা শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। অথচ পিতার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিল। চারুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল। এক বৎসরের জন্য উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনেত্রে বিদায় গ্রহণ করিল।

"মডের পিতার নিকট তাহারা যে সত্যে আবদ্ধ হইয়াছিল, এক বৎসর কাল ধর্ম্মভাবে তাহা পালন করিল। কেবল ফ্রেডের নিকট পরস্পরের সংবাদ তাহারা পাইত। মড ভাইকে কেমব্রিজে যে পত্র লিখিত, ফ্রেড্ চারুকে সে সকল দেখিতে দিত। এক বৎসরকাল সেই পত্রগুলিই চারুর অবলম্বন ছিল। আবার, ছুটিতে ফ্রেড্ বাড়ী আসিলে, চারু তাহাকে যে সকল পত্র লিখিত, ফ্রেড সেগুলি ভগিনীকে দেখাইত।

"এইরূপে সুদীর্ঘ পরীক্ষাকাল অতিবাহিত হইল। চারু আবার আসিল। মডের পিতামাতার সম্মতিক্রমে তাহারা বিবাহ-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইল। পরম আনন্দে দুইজনে দিনযাপন করিতে লাগিল।

"জুন মাসের ১৬ই তারিখে চারু বারে কলড্ হইবে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে

বিবাহের দিনস্থির হইল। বিবাহের পর এক পক্ষ কাল নবদম্পতী ইতালীদেশে মধুচন্দ্র যাপন করিয়া, ব্রিন্দিসি হইতে স্বদেশে যাত্রা করিবে।

"তাহার পিতামাতার এ বিবাহে সম্মত হওয়া সম্বন্ধে চারুর মনে সংশয় ছিল। অথচ পিতামাতার প্রতি তাহার ভক্তি ও ভালবাসা যথেষ্ট। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ না করিয়া বিবাহ করিতে কিছুতেই তাহার মন সরিতেছিল না। তাই সে একখানি দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা লিখিয়া, অনেক মিনতি করিয়া পিতামাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল।

"চারু হিসাব করিয়া দেখিল, যেদিন বারে সে কল্ড্ হইবে, তাহার দুইদিন পরে ভারতবর্ষ হইতে পিতার উত্তর আসিবে। পত্র প্রতীক্ষায় শেষ সপ্তাহ সে অতি বিমর্ষভাবে কাটাইল। তাহার মনে হইল, পিতামাতার বিনা আশীর্ব্বাদে বিবাহ করিতে হইলে, মিলনের অর্দ্ধেক আনন্দ তাহার চলিয়া যাইবে।"

এই সময় দাসী আলো জ্বালিয়া দিতে আসিল। আলো জ্বালিয়া, অগ্নিকুণ্ডে আবার প্রচুর পরিমাণ কয়লা নিক্ষেপ করিল। অগ্নিদেব লেলিহ রসনা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আমার মনে একটা বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছিল—এই মড্ মিস্ ক্যাম্বেল ছাড়া আর কেহই নহে। উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার পর?—কি উত্তর আসিল?"

মিস্ ক্যাম্বেল বলিলেন—"পত্রের কোন উত্তর আসিল না। ১৮ই জুন—সেদিন ওয়াটার্লু যুদ্ধজয়ের বার্ষিকোৎসব—পত্রের পরিবর্ত্তে চারুর বৃদ্ধ পিতা স্বয়ং আসিয়া পড়িলেন। মডের পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া, বলিতে লাগিলেন—'আমায় ক্ষমা করুন। আমার ঐ একমাত্র পুত্র। আমাদের বুড়াবুড়ীর ঐ একমাত্র অবলম্বন। দেশে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উহাকে জাতিতে তুলিয়া লইব। সেইখানে হিন্দুমতে উহার বিবাহ দিব। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে জন্মের মত উহার জাতিচ্যুত ঘটিবে—বংশাবলীক্রমে আর কখনও সমাজে উঠিবার আশা থাকিবে না। ছেলেকে আমি ঘরে রাখিতে পারিব না। মরিবার সময় আমাদের মুখেও জলগণ্ডুষ দিবার অধিকারী থাকিবে না। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিলে আমার স্ত্রী শোকে আত্মহত্যা করিবে—আমি দুঃখে পাগল হইয়া যাইব। কাশ্মীর বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া, বোম্বাই হইতে জাহাজে আমি আসিয়াছি। সারাপথ চিঁড়া খাইয়া আসিয়াছি। আমার ধন আমায় ফিরাইয়া দিন"।

"মডকেও তিনি মাতৃসম্বোধন করিয়া ঐ প্রকার বলিতে লাগিলেন।

"মডের পিতা বলিলেন—'পাত্র পাত্রী উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক। উহারা ভাল বুঝিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। আমি নিশ্চয়ই তাহাতে বাধা দিব না, আপনারও বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। মনে রাখিবেন ইহা ইণ্ডিয়া নয়—ইহা গ্রেট ব্রিটেন—স্বাধীন দেশ।'

"মডের পিতা তখন চারুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। চারু বলিল—'আমি বিবাহ করিব। পিতার সম্মতি পাইলাম না—ইহা আমার পক্ষে চরম দুর্ভাগ্য। তথাপি আমি বাগ্‌দত্তা বধূকে পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিতে প্রস্তুত নহি।'

"চারুর পিতা বলিলেন—'ওরে পাষাণ, বাগ্‌দত্তা বধূ পরিত্যাগই কি কেবল অধর্ম্ম? পিতৃমাতৃহত্যা কি পুণ্য কার্য্য?"

"চারু তথাপি অটল রহিল, কিন্তু মড্‌ বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল—'এমন অবস্থায় আমি কখনই চারুকে বিবাহ করিব না।'

"তাহার পিতামাতা, ফ্রেড, ক্যাথরিণ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মড্‌ কিছুতেই রাজী হইল না।

"অবশেষে চারু তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া প্রেমের দোহাই দিয়া বত মিনতি করিল। কিন্তু মড্‌ তথাপি স্বীকৃত হইল না।

"তখন চারু বলিল—আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যেরূপ ঐকান্তিক বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতাম, তাহা যদি যথার্থ হইত, তবে আমাদের মিলনের কোন বাধাই তোমায় নিরস্ত করিতে পারিত না। আমার সে বিশ্বাস কি তবে ভুল?'

"মড্‌ এ কথার প্রতিবাদ করিল না।

"চারু বলিল—'বুঝিয়াছি। বিচ্ছেদ যখন অপরিহার্য্য, তোমার অচল ভালবাসা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেও জীবনে অনেক সান্ত্বনা পাইতাম। সে সান্ত্বনা হইতেও তুমি আমায় বঞ্চিত করিলে!'

"মড্‌ তথাপি এ কথার কোন প্রতিবাদ করিল না।

"চারু তখন মডের দক্ষিণ হস্তখানি নিজ হস্তের মধ্যে ধারণ করিয়া, তাহার উপর অজস্র চুম্বন ও অনাবিল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর জন্মের মত বিদায় লইল।"

এই শোক কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমারও চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। মিস্‌ ক্যাম্বেল নীরব হইলেন। কষ্টে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার পর?"

কয়েক মুহূর্ত্ত মিস্‌ ক্যাম্বেলও কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ডযুগল দিয়া

বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়াইতে লাগিল। আমি এ দৃশ্য দেখিয়া মস্তক অবনত করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—"মড্ তখন প্রতিবাদ করে নাই, কিন্তু একদিন প্রতিবাদ করিবে। পরলোকে আবার যখন চারুর সহিত দেখা হইবে—তখন প্রতিবাদ করিবে বলিয়া সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। চারু চলিয়া গেলে পর মড্ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জীবনের কোন আশা ছিল না। কিন্তু যে দুর্ভাগিনী, অত সহজে সে মরিবে কেন? দেশ হইতে আনাইয়া চারু তাহাকে দুই জোড়া সোনার চুড়ি দিয়াছিল। সেই চুড়ি সর্ব্বদা সে পরিয়া থাকিত। কয়েক বৎসর হইল, একদিন হঠাৎ সে একখানি ভারতীয় সংবাদ-পত্রে দেখিল, তাহার বাঞ্ছিত ইহজগতে আর নাই। সেইদিন সে হাতের চুড়িগুলি খুলিয়া ফেলিল। সে শুনিয়াছিল, হিন্দুবধূ বিধবা হইলে হাতে আর চুড়ি পরে না। মডের শয়নকক্ষে তাহার প্রণয়ীর একখানি তৈলচিত্র আছে। তাহাই দেখিয়া ইহ-জগতের পরপারে চিরমিলনের প্রতীক্ষা করিয়া সে জীবন ধারণ করে।"

বলিয়া মিস্ ক্যাম্বেল নীরব হইলেন। আমি অশ্রুমোচন করিয়া, পূর্ব্বং অবনত মস্তকে ভাবিতে লাগিলাম—কে সেই ব্যারিষ্টার! কলিকাতার অধিকাংশ প্রবীণ ব্যারিষ্টারকেই ত আমি চিনি। কোন্ বৎসরের এ ঘটনা জানিতে পারিলে ল-লিষ্ট দেখিয়া নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিতে পারিব। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ বৎসর এ ঘটনা ঘটিয়াছিল?"

কোনও উত্তর নাই!

আমি তখন মাথা তুলিয়া দেখিলাম, মিস্ ক্যাম্বেল নিস্পন্দ—তাঁহার চক্ষু পলকশূন্য—তাঁহার মস্তক একদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সর্ব্বনাশ!—ইনি মূর্চ্ছিতা।

তড়িত্তারলগ্ন ঘণ্টার ফিতা ধরিয়া ভয়ানক জোরে টান দিলাম। দাসী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"কি মহাশয়?"

"তোমার ঠাকুরাণী মূর্চ্ছা গিয়েছেন; জল—জল আন।"

দাসী ছুটিয়া জল আনিতে গেল। আমি সমস্ত জানালাগুলা খুলিয়া দিলাম। বরফের মত শীতল বাতাস কক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। মিস্ ক্যাম্বেলের অঙ্গ হইতে শালটা খুলিয়া ফেলিয়া দিলাম। জল আসিল। তাঁহার মুখে চোখে সেই কনকনে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিলাম। দাসী তাঁহার পোষাকের কিয়দংশ খুলিয়া দিল। স্মেলিং সল্ট আনিয়া তাঁহার নাসারন্ধ্রে ধরিল। মিস্ ক্যাম্বেল তখন ধীরে ধীরে মাথাটা তুলিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কি হইয়াছে?"

দাসী বলিল—"ঠাকুরাণী, আগুনের গরমে আপনি মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।"

আমি বলিলাম—"ঘরের সকল জানালা এমন বন্ধ করিয়া এত আগুন জ্বালা ভুল হইয়াছিল। এখন আপনি কেমন আছেন মিস্ ক্যাম্বেল ?"

"আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম ? কষ্ট দিলাম—মাফ করিও। এখন ভাল আছি।"

আমি বলিলাম—"চলুন, আপনাকে শয্যায় লইয়া যাই।"

"চল"—বলিয়া তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু আবার তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। ছিন্নলতার ন্যায় তিনি চেয়ারে লুটাইয়া পড়িলেন।

দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয়নকক্ষে লইয়া লইয়া গেলাম। পালঙ্কের উপর তাঁহাকে শোয়াইয়া দাসীকে বলিলাম—"আমি ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনি। তুমি ততক্ষণ যতটা পার ইঁহার বহিরাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দাও"—বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র দেখিলাম, ভিত্তিগাত্রে একখানি তৈলচিত্র—আমার পিতার যুবামূর্ত্তি! ইহা যে ফোটোগ্রাফের অনুলিপি, তাহার এক খণ্ড আমার অ্যালবমেও রক্ষিত আছে।

সমস্তই বুঝিলাম। ছুটিয়া গিয়া ডাক্তার আনিলাম। তাঁহার ঔষধে এবং আমাদের শুশ্রূষায়, রাত্রি নয়টার মধ্যে মিস্ ক্যাম্বেল প্রকৃতিস্থ হইলেন। একপেয়ালা গরম সুরুয়া তাঁহাকে পান করাইয়া, রাত্রির মত আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত ঘটনার পর একটি বৎসর আমি বিলাতে ছিলাম। মিস্ ক্যাম্বেলের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতাম। তিনি আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহাকে পত্রাদি লিখিবার সময় মাতৃসম্বোধন করিয়া লিখিতাম; কিন্তু সাক্ষাতে বলিতে পারিতাম না—কেমন লজ্জা করিত।

পরে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে আমায় দেখিবামাত্র আমার পিতার সহিত প্রবল সৌসাদৃশ্য অনুভব করিয়াছিলেন। আমার পরিচয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি সেদিন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিয়েনা রেস্তোর"াতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নচেৎ প্রকাশ্য স্থানে ভোজনাদি করা তাঁহার নিতান্তই অপ্রীতিকর।

যথাসময়ে আমি বারে কলড হইলাম। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করিলাম। বলিলাম—"আপনি এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন। এখন সর্ব্বদা আপনার সেবাযত্নের আবশ্যক। আমার গৃহে আসিয়া, মাতৃগৌরবে আমার সেবা গ্রহণ করুন।"—কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলাম না। বলিলেন—এ বয়সে জন্মভূমি ছাড়িয়া অন্য কোথাও গেলে আমি শান্তি পাইব না।"

দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতি মেলেই তাঁহাকে পত্র লিখিতাম এবং তাঁহার পত্র পাইতাম। আমার যখন বিবাহ হইল, আমার স্ত্রীকে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি সেই সোণার চুড়ি দুই জোড়া পাঠাইয়া দিলেন। আমার স্ত্রী সর্ব্বদা সেগুলি পরিয়া থাকেন।

তাহার পর খোকা জন্মিল। তিনি লিখিলেন, খোকা একটু বড় হইলেই তাহাকে ও তাহার মাকে লইয়া আমি যেন একবার বিলাত যাই। মরিবার পূর্ব্বে, আমাদের তিন জনকে একবার দেখিবার তাঁহার বড় সাধ হইয়াছে। এ কথা উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পত্রেই লিখিলেন। সে বৎসর পূজার ছুটিতে আমরা বিলাত যাইব সমস্ত স্থির হইল। তাঁহাকে এ সংবাদ লিখিলাম। কিন্তু পত্রখানি দেড়মাস পরে ফিরিয়া আসিল। খামের উপর লণ্ডনের পোষ্ট আফিস রবারষ্ট্যাম্পের ছাপ মারিয়া দিয়াছে—"মালিক মৃত, পত্র বিলি হইল না।"

আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম।

[চৈত্র, ১৩১৭]